অশোকের বাণী

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
জানুয়ারী, ১৯৮১

Published by :
ANIMA PRAKASHANI
141 Keshab Chandra Sen Street,
Calcutta-700009.

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭/জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীদ্বিজদাস কর
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক :
শ্রীকালীশঙ্কর গুহ
সরযু প্রেস
চাতরা, শ্রীরামপুর,
হুগলী।

যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, উৎসাহ এবং প্রেরণা আমাকে বইখানি ,লিখতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই প্রাজ্ঞ সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের করকমলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পিত।

বাণী-সঙ্কয়ন

সমস্ত জনগণের মঙ্গল সাধনের চেয়ে আমার আর কোন বৃহত্তর কর্তব্য নেই। আমি যত কিছু চেষ্টা করি, তার উদ্দেশ্য এই যেন জীব-জগতের কাছে আমার ঋণ পরিশোধিত হয়। —ষষ্ঠ মুখ্য গিরিশাসন

সকল মনুষ্য আমার সন্তান। যেমন আপন সন্তানদের সম্পর্কে আমি চাই যে, তারা যেন ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত রকম হিত ও সুখ লাভ করে, ঠিক তাই আমি সকল মানুষের বেলাতেও ইচ্ছা করি।

—ষোড়শ মুখ্য গিরিশাসন

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা এই যে, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের অনুসরণকারী প্রজাগণ কোনও অঞ্চলবিশেষে বাস না করে সর্বত্র মিলে-মিশে বাস করুক। —সপ্তম মুখ্য গিরিশাসন

তিনি চান যেন সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধর্মের সার বৃদ্ধি পায়।... নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা যেন সামান্য কারণে কখনও কেউ না করে। আর গুরুতর কারণ থাকলেও যেন তা সামান্য মাত্রই করা হয়।...এটাই দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা যেন সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন ধর্মমতের বিষয়ে জানে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়।

—দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসন

আমার এই ইচ্ছা, তোমরা (রাজপুরুষগণ) সেই প্রত্যন্তবাসীদের মনে [এই আস্থা] দৃঢ় করাবে—"রাজা এই চান যে, তোমরা আমার সম্বন্ধে অনুদ্বিগ্ন ও আশ্বস্ত হও; আমার কাছ থেকে তোমরা কেবল সুখই পাবে, কখনও দুঃখ পাবে না।" —পঞ্চদশ মুখ্য গিরিশাসন।

অন্য কোনওরূপ দান বা অনুগ্রহ ধর্মদান ও ধর্মানুগ্রহের মত ফলপ্রসূ নয়। ...যার ফলে স্বর্গগমন সম্ভব হয়, তার চেয়ে ভাল করণীয় কাজ আর কি হতে পারে? —নবম মুখ্য গিরিশাসন

মৌর্যযুগের একটি স্তম্ভের শীর্ষস্থিত বৃষমূর্তি। এটি বর্তমানে নূতন-দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। স্তম্ভটিতে কোনও লেখ উৎকীর্ণ হয় নি।
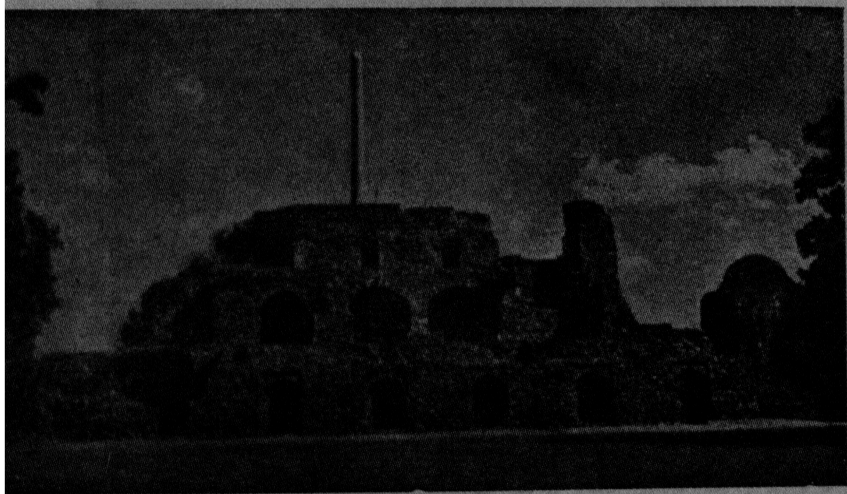
আম্বালা জেলার তোপ্‌রা থেকে সুলতান ফীরূজ শাহ্‌ দিল্লীতে যে অশোকস্তম্ভটি নিয়ে এসেছিলেন, সুলতানের নির্মিত তিনতলা কোট্‌লার উপর স্থাপিত সেই স্তম্ভ। কোট্‌লাটি বর্তমান দিল্লীর পূর্বদক্ষিণে দিল্লী-দরোজায় অবস্থিত।

(২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

কয়েক বৎসর পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারত সরকার এক সাংস্কৃতিক উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বর্গত দেশনায়ক পরমশ্রদ্ধেয় সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন্ মহোদয় ছিলেন ঐ উৎসব কমিটির সভাপতি। তাঁর পরামর্শে তখন আমার Inscriptions of Asoka (অশোকের লেখমালা) সংজ্ঞক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হয় এবং ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। বইটির রচনায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারত এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় রাজর্ষি অশোকের বাণী প্রচার। এই উদ্দেশ্য যে অনেকখানি সিদ্ধ হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি ইংরেজী ১৯৭৮-৭৯ সালে আমি যখন বিশ্বভারতীর Visiting Professor হিসাবে শান্তিনিকেতনে ছিলাম, তখন সেখানকার প্রাক্তন অধ্যাপক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় আমার উল্লিখিত বইটির তৃতীয় সংস্করণের একখণ্ড পাঠ করে বাংলা ভাষায় কিছু বড় করে ঐ ধরনের একখানি গ্রন্থ লিখতে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর অনুরোধেরই ফল। বর্ধিত আকারে লিখতে গিয়ে গ্রন্থখানিকে আমরা নানা নূতন তথ্যের সমাবেশে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি।

গৌতম বুদ্ধ এবং মৌর্যবংশীয় সম্রাট্ অশোক বিশ্ব-ইতিহাসের দুজন শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁরা বিশ্বসভ্যতায় ভারতের সর্বোত্তম অবদানের মধ্যে গণ্য হতে পারেন। সেই বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে অশোক যে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁর অনুশাসনমালায় সেই ধর্মের বাণীই বারবার ঘোষিত হয়েছে। অনুশাসন প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অশোক নিজেই বলেছেন, "আমি যে কারণে এই ধর্মলিপিটি এখানে প্রস্তরে লিখিয়েছি, সেটা এই যে, লোকে যেন এটি অনুসরণ করে চলে এবং ইহা যেন চিরস্থায়ী হয়। যে ব্যক্তি এটি অনুসরণ করে চলবে তার পুণ্য কার্য করা হবে।" —দ্বিতীয় মুখ্য স্তম্ভশাসন।

বর্তমান গ্রন্থে অশোকের বাণী বাঙালী পাঠকসাধারণের জন্য সহজভাবে উপস্থাপিত করা হল। এর ফলে যদি সেই মহামানবের উদ্দেশ্য সামান্যমাত্রও সফল হয়, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। গ্রন্থখানি ত্রুটিহীন করতে আমরা অবহেলা করি নি। তবু যদি পাঠকগণ কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পান, দয়া করে তা জানালে আমরা সংশোধন করতে সচেষ্ট হব।

আক্ষরিক অনুবাদে ভাষার আড়ষ্টতা এড়ানো যায় না। তা সহজবোধ্যও হয় না। রাজর্ষি অশোকের বাণী সাধারণের বোধগম্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই আমরা মূল অনুশাসনের ব্যঞ্জনা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তৃতীয় মুখ্য গিরিশাসনে অশোক নিজেও অনুশাসন প্রচারের বিষয়ে তার কারণ বা উদ্দেশ্য এবং ভাষার ব্যঞ্জনার উপর জোর দিয়েছেন। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের রূপনাথ পাঠে এবং সারনাথের দ্বিতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনের পাঠেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছু পরিষ্কার হবে। পঞ্চম মুখ্য গিরিশাসনে অশোক যা বলেছেন, তা সংস্কৃত করলে দাঁড়ায়—'ময়া ধর্মমহামাত্রাঃ কৃতাঃ', অর্থাৎ "আমি ধর্মমহামাত্রগণকে [তৈয়ারী] করেছি।" কিন্তু বাক্যটির প্রকৃত অর্থ— "আমি ধর্মমহামাত্রসংজ্ঞক কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেছি।" আমাদের অনুবাদে আমরা অশোকের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে সচেষ্ট হয়েছি।

ঐ একই কারণে অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত কোনও কোনও নামের প্রাকৃতরূপের পরিবর্তে আমরা সংস্কৃতরূপ ব্যবহার করেছি। 'মহামাত্র' প্রভৃতি শব্দেও অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃতরূপ বর্জন করা হয়েছে।

আজকাল একশ্রেণীর ঐতিহাসিক বলছেন যে, জনসাধারণের কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস; সুতরাং ইতিহাসে রাজাদের কথা অনেকটা অবান্তর। কিন্তু রাজগণের আলোচনা দ্বারা কালানুক্রমিক রাজনীতিক ইতিহাসের একটা পটভূমি বা কাঠামো প্রস্তুত না করলে জনসাধারণের কাহিনী যথাযথভাবে দাঁড় করানো যায় না। প্রাচীন ভারতীয়দের লিখিত কোন ইতিহাস না থাকায়, এটার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। মেগাস্থেনিস যে যুগের ভারতবাসীর কথা বলেছেন তার আলোচনা করতে গেলেই তো চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিষয় এসে পড়ে। তাছাড়া, অশোক কেবলমাত্র রাজা ছিলেন না; তাঁর সমাজসংস্কার এবং ধর্মপ্রচারের কথা ভুললে চলবে না। অশোকের অনুশাসনমালার প্রধান কথাই হল, কিসে জনসাধারণের ধর্মভাব বর্ধিত হবে এবং কি করলে তারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে। এতো জনসাধারণেরই কথা। একে রাজরাজড়ার ইতিহাস বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন, গোঁড়ামি ব্যতীত আর কিছু নয়।

৬৪৫ নিউ আলিপুর,
কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সরকার

ভূমিকা

১। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস

ইতিহাসের সকল যুগেই বিশ্বের সভ্যতায় ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কিন্তু সেই অবদানের পরিমাণ ও গুরুত্ব প্রাচীন যুগেই সর্বাপেক্ষা অধিক। আর্যভাষার অন্যতম সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ সেই সময়ে রচিত হয়। যাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে পরিগণিত সেই গৌতম বুদ্ধ এবং রাজর্ষি অশোক ঐ যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতিতে ভারতীয় প্রতিভার আশ্চর্যজনক বিকাশও সে আমলেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষতঃ তখন বাহির থেকে নানা জাতি ভারতে এসে এদেশের জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে পেরেছিল। আমরা জগতের ইতিহাসে দেখতে পাই, যে সকল ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায় আপন সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব ও গর্ব বোধ করে, তারা সহজে এবং স্বেচ্ছায় স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করে না। সেদিক্ থেকে দেখলে, গ্রীস এবং চীন দেশের আত্মসভ্যতা সম্পর্কে সচেতন ও অভিমানী অধিবাসীর পক্ষে সেকালে ভারতীয় ধর্ম অবলম্বন প্রাচীন জগতের ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন কালে লিখিত ভারতের কোনও ইতিহাসগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নি। সুপ্রাচীন যুগের ভারতীয়গণকে আপনাদের ক্রিয়াকলাপের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী দেখা যায় না। তাই সেই গৌরবময় যুগের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা এ যুগে নানা ভাবে করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এদেশে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম জগতের পণ্ডিতগণ এই কাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা নানা ভারতীয় এবং বিদেশীয় গ্রন্থ থেকে ভারত-ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁরাই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী বর্ণমালায় লিখিত লেখাবলীর পাঠোদ্ধার

সূচিত করেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত অগণিত গ্রন্থাবলীতে যেমন প্রধান ও অপ্রধান নানা শ্রেণীর জনগণের কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনই বিশাল লেখ-সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারার অজস্র প্রতিফলন দেখতে পাই।

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারের কাহিনী কৌতূহলজনক। ব্রাহ্মীর বিবর্তনের ফলে বাংলা, নাগরী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে। এই ব্রাহ্মীই বহির্ভারতের তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাই (শ্যাম) দেশ, যবদ্বীপ, কাম্পুচিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের বর্ণমালারও জননী। কিন্তু মধ্যযুগেই ব্রাহ্মী বর্ণমালার আদি, মধ্য ও অন্ত্য রূপ পড়বার উপযুক্ত পণ্ডিত ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যেত না। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলুক (১৩৫১-৮৮ খ্রী) অম্বালা ও মেরাঠ থেকে অশোকের ব্রাহ্মী লেখযুক্ত দুটি শিলাস্তম্ভ দিল্লীতে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক চেষ্টাতেও স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখাবলী পড়তে সমর্থ কাউকে তিনি খুঁজে পান নি। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্য এই দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করল। তাঁরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা শিখলেন এবং তৎকালীন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা ও নাগরী বর্ণমালার ভিত্তিতে পূর্ব-পূর্ব শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করতে লাগলেন। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে শীঘ্রই তাঁরা দিনাজপুর জেলার বাদালে প্রাপ্ত গুরব মিশ্রের শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হলেন। এই লেখটি নবম শতাব্দীর পাল বংশীয় নরপতি নারায়ণ পালের রাজত্বকালে (আ ৮৬০-৯১৭ খ্রী) লিখিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের উৎসাহ বেড়ে গেল এবং অল্পকাল পরেই তাঁদের পক্ষে গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়ের গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ মৌখরিরাজ অনন্তবর্মার লেখের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হল। এটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অর্থাৎ গুপ্তযুগের অন্ত্য ব্রাহ্মী বর্ণমালায় লিখিত। সুতরাং গুপ্তযুগের অন্যান্য লেখমালার পাঠোদ্ধারে আর বাধা রইল না। কিন্তু তখনও আদি ব্রাহ্মীতে

লিখিত অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। কারণ আদি এবং অন্ত্য ব্রাহ্মীতে কতকগুলি অক্ষরের আকারে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না।

অবশ্য ইতিমধ্যে নানা দিক্‌ থেকে নানা জনের চেষ্টায় আদি ব্রাহ্মীর কতকগুলি অক্ষরের পাঠ নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল। এটাও স্পষ্ট হয়েছিল যে, ব্রাহ্মীলিপি বাম থেকে ডান দিকে পড়তে হয়। এ সম্পর্কে আফগানিস্তানের যবন (গ্রীক) জাতীয় **Pantaleon** ও **Agathocles** নামক দুজন নরপতির মুদ্রার সাক্ষ্য বেশ মূল্যবান্‌। এই রাজদ্বয়ের মুদ্রায় গ্রীক ভাষায় লেখ দেখা যায়— **Basileos Pantaleontos** (রাজা পন্তলেবের [মুদ্রা]) এবং **Basileos Agathukleous** (রাজা অগথুক্লেয়র [মুদ্রা]) এবং প্রাকৃত ভাষায় এর ভারতীয় অনুবাদ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে— 'রজিনে পংতলেবস' (সংস্কৃত—'রাজ্ঞঃ পন্তলেবস্য [মুদ্রা]') এবং 'রজিনে অগথুক্লেয়স' (সংস্কৃত 'রাজ্ঞঃ অগথুক্লেয়স্য [মুদ্রা)']। কিন্তু কয়েকটি আদি ব্রাহ্মী অক্ষরের মূল্য ঠিক বুঝতে না পারায় বেশ কিছুদিন অশোকের অনুশাসনগুলি পড়া সম্ভব হল না। এই সময় **James Prinsep** সাহেব সাঁচী স্তূপ থেকে সংগৃহীত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি ব্রাহ্মী লেখের ছাপ পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন যে, লেখগুলির শেষ দুটি অক্ষর অনেক ক্ষেত্রেই এক। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমন্দিরে এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখ আছে এবং সেগুলিতে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণের দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মনে হল, তবে তো সাঁচী লেখাবলীর শেষের অক্ষর দুটি 'দানং' হতে পারে। পরীক্ষাতে দেখা গেল, ঐ অনুমান সত্য। ফলে 'দ' এবং 'ন' এই অক্ষরদ্বয়ের আদি ব্রাহ্মী আকার চেনা গেল। গুপ্ত যুগের অন্ত্য ব্রাহ্মী বর্ণমালায় এই দুটি অক্ষরের আকৃতি একেবারেই পৃথক্‌। এখন আদি ব্রাহ্মীলিপি পাঠে আর বাধা রইল না। **Prinsep** তখন অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার কার্য সম্পূর্ণ করলেন। অনুশাসনে রাজার নাম পাওয়া গেল 'দেবানংপ্রিয়

পিয়দসি' (সংস্কৃত 'দেবানাংপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী' অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী)। বোঝা গেল যে, লেখগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান পাকিস্তানের অনেক অংশে ইরানের হখামনীষীয় (Achaemenian) বংশের রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের দরবারী ভাষা ও লিপি ছিল আরামায়িক। এই সূত্রে ভারতের ঐ অঞ্চলে আরামায়িক বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ভারতীয় খরোষ্ঠী লিপি এদেশের হখামনীষীয় অধিকৃত অংশে প্রচলিত আরামায়িকের বিবর্তিত রূপ। পশ্চিম এশিয়ার লিপি সমূহের ন্যায় খরোষ্ঠী ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়তে হয়। এতে 'আ'কার প্রভৃতি কয়েকটি স্বরবর্ণের বা তাদের মাত্রা চিহ্নের ব্যবহার নেই। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যবন (গ্রীক) ও অন্যান্য বিদেশীয় রাজগণের মুদ্রা থেকেই প্রধানতঃ খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। কারণ তাঁদের মুদ্রায় গ্রীক লেখের খরোষ্ঠী-তে লিখিত প্রাকৃত অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন Eu-cratides (এবুক্রেতিদ) নামক খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর জনৈক যবন-রাজের মুদ্রায় Basileos Megalou Eukratidou এই গ্রীক লেখটির খরোষ্ঠীতে লিখিত প্রাকৃত অনুবাদ পাই 'রজস মহতস এবুক্রেতিদস' (সংস্কৃত— 'রাজ্ঞঃ মহতঃ এবুক্রেতিদস্য')। 'রজ মহত' এই রাজোপাধি ইরানের প্রাচীন Khshayathiya Vazrka রাজোপাধির অনুকরণ। যবনরাজগণ পরে এর স্থলে 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করতেন। ক্রমে ভারতীয় রাজগণের মধ্যে ধীরে ধীরে বিদেশীয়দের অনুকরণে মহারাজ, রাজাধিরাজ, মহারাজাধিরাজ, স্বামী, ভট্টারক, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর প্রভৃতি উপাধির ব্যবহার প্রচলিত হয়। যা হক, কিছুকাল পরে অশোকের অনুশাসন সমূহের ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির তুলনা-মূলক পাঠ সম্ভব হয়েছিল।

পুরাণের রাজবংশ বর্ণনা এবং বৌদ্ধসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের ব্যাপারে অনেকটা কাজে লাগল। এ বিষয়ে কোনোরকম গ্রন্থের সাহায্যই বাদ দেওয়া হল না। এমন কি, ব্যাকরণ

ও জ্যোতিষবিষয়ক পুস্তক থেকেও উপাদান সংগৃহীত হতে লাগল। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' সংজ্ঞক বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা। 'মহাভাষ্যে' বর্তমান কালের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—'ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ' (আমরা এখানে পুষ্যমিত্রের জন্য যজ্ঞ করছি)। এ থেকে অনুমান করা হল যে, পতঞ্জলি মগধের মৌর্য বংশের পরবর্তী শুঙ্গ বংশের আদি নরপতি পুষ্যমিত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। আবার পতঞ্জলি অনদ্যতন অর্থাৎ অল্পকাল পূর্বের অতীতের উদাহরণ দিয়েছেন— 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' (যবনরাজ সাকেত অবরোধ করেছিলেন), 'অরুণদ্ যবনো মধ্যমিকাম্' (যবনরাজ মধ্যমিকা অবরোধ করেছিলেন)। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হল যে, পতঞ্জলির জীবনকালের প্রথম দিকে এবং পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বের সূচনার কাছাকাছি অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তর আফগানিস্তানের বাহ্লীকবাসী যবন বা গ্রীকগণ অযোধ্যার সন্নিহিত সাকেতনগর এবং চিতোড়ের নিকটবর্তী মধ্যমিকা-নগরী অবরোধ করেছিল। প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং অগণিত মুদ্রায় এই যবনজাতীয় রাজগণের উল্লেখ পাওয়া গেল। আবার 'গার্গীসংহিতা' সংজ্ঞক একখানি জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জানা গেল যে, মৌর্যবংশের অবসানের কাছাকাছি সময়ে যবনেরা সাকেত, পঞ্চাল দেশ, মথুরা প্রভৃতি অধিকার করে পূর্ব দিকে পুষ্পপুর অর্থাৎ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র (আধুনিক পাটনা) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকদের ধারণা হল যে, মৌর্যবংশের অবসান এবং শুঙ্গবংশের অভ্যুত্থান এই যবন আক্রমণেরই ফল।

২। ইতিহাসের উদ্ধারকার্যে লেখমালার অবদান

এ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস যতটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার তিন-চতুর্থাংশের জন্য আমরা সেকালের লেখমালার কাছে ঋণী। প্রাচীনকালের মুদ্রা থেকেও দশ-শতাংশ মত সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে মৌর্যবংশীয় অশোক সম্বন্ধে কিছু কিছু

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। লেখমালায় তাঁর ধর্মমত এবং কার্যকলাপ বিষয়ে যে জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়, তেমন কিছু অন্যত্র মেলে না। আবার কলিঙ্গদেশীয় খারবেল, মগধের গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত, দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশী, তামিলনাডুর রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজগণ সম্পর্কে ভারতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে নীরব। তাঁদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ লেখমালা থেকেই জানা যায়। এঁদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রাতেও তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আছে। অবশ্য কতকগুলি রাজা এবং রাজবংশের নাম কেবলমাত্র মুদ্রা থেকেই জানা যায়। সে যাই হক, কি ভাবে আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান ধীরে ধীরে বেড়েছে এবং এখনও বাড়ছে, একটা উদাহরণ দিয়ে তা সহজে বোঝানো যাবে।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের পূর্ব-মালব অঞ্চলস্থিত সাগর জেলার অন্তর্গত এরাণ গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালেখ থেকে বুধগুপ্ত রাজার নাম সর্বপ্রথম জানা যায়। ১৬৫ গুপ্ত সংবৎসরে অর্থাৎ ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বুধগুপ্তের অধীন সুরশ্মিচন্দ্র কালিন্দী (যমুনা) ও নর্মদার মধ্যবর্তী ভূভাগের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তখন এরাণের ক্ষুদ্র সামন্তরাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁর ভাই ধন্যবিষ্ণু ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে ধ্বজ স্থাপন করেছিলেন। অর্ধ শতাব্দী পরে ঐ অঞ্চলেই বুধগুপ্তের কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। সেগুলি ১৭৫ গুপ্ত সংবৎসরে অর্থাৎ ৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ জানলেন যে, পূর্ব-মালবের রাজা বুধগুপ্ত ৪৮৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বছর দশেক রাজত্ব করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **John Allan** সাহেবের গুপ্ত বংশের মুদ্রা বিষয়ক সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই রকম কথাই আছে। কিন্তু ঐ সময়েই সারনাথে প্রাপ্ত ১৫৭ গুপ্ত সংবৎসরের (৪৭৬ খ্রী) মূর্তিলেখ প্রকাশিত হওয়ায় জানা গেল যে, বুধগুপ্তের রাজ্য পূর্ব-মালব থেকে বারাণসী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তিনি প্রায় বিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তখন কেউ কেউ সন্দেহ করলেন, হয়ত বা বুধগুপ্ত মগধের গুপ্ত সম্রাট্গণের বংশধর ছিলেন। পাঁচ-ছয় বৎসর

পরে উত্তর-বাংলার দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি প্রকাশিত হওয়ায় ঐ ধারণার জোর সমর্থন পাওয়া গেল। কারণ শাসনগুলি পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তি বা প্রদেশের শাসন-কর্তৃগণের আমলে প্রদত্ত হয়েছিল এবং পাঁচখানি শাসনের মধ্যে দুখানি বুধগুপ্তের রাজত্বকালীন আর দুখানি গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ প্রথম কুমার-গুপ্তের রাজ্যকালে প্রদত্ত। সুতরাং এখন দেখা গেল যে, বুধগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য পূর্ব-মালব থেকে উত্তর-বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তখনও গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের সঙ্গে বুধগুপ্তের সম্পর্কের কোনও প্রমাণ মেলে নি। সেটা মিলল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বুধগুপ্তের নালন্দায় প্রাপ্ত শীলমোহর থেকে জানা গেল যে, তিনি ছিলেন পুরু-গুপ্তের পুত্র, প্রথম কুমারগুপ্তের পৌত্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রপৌত্র এবং দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। এইরূপে শতাধিক বৎসর অপেক্ষার পর ঐতিহাসিকেরা রাজা বুধগুপ্তের পরিচয় পেলেন। অবশ্য এখনও বুধগুপ্তের রাজত্বকালের অনেক বিষয় আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। তবে নূতন শিলালেখ-তাম্রশাসনাদি আবিষ্কারের ফলে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আবার উল্লিখিত লেখাবলীতে যে কেবল রাজগণ এবং তাঁদের শাসনকর্তাদেরই উল্লেখ আছে, তাই নয়; অগণিত গ্রাম্য কর্মচারী, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সাধারণ গ্রামবাসীর বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। সারনাথ লেখ থেকে জানা যায়, অভয়মিত্র নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর পিতামাতা ও গুরুর এবং জগদ্বাসীর পুণ্যের জন্য একটি বিচিত্র বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দামোদরপুর তাম্র শাসনের একটিতে দেখা যায়, নাভক নামক গ্রাম-প্রধানের প্রার্থনা-ক্রমে তাঁর কাছ থেকে দুই দীনার মূল্য গ্রহণ করে পলাশবৃন্দক নামক স্থানের অষ্টকুলাধিকরণ বা পঞ্চায়েত সভা নাগদেব নামক ব্রাহ্মণকে চণ্ডগ্রামে এক কুল্যবাপ পতিত সরকারী জমি নিষ্কর দানের ব্যবস্থা করে। এই ভূমি বিক্রয় ব্যাপারে আধুনিক পাটোয়ারীর মত পুস্ত-পাল সংজ্ঞক কর্মচারীর বিক্রেতব্য ভূমিখণ্ড নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল।

গ্রামপ্রধানের এই অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজের এবং তদীয় পিতা-মাতার পুণ্য বৃদ্ধি। আবার দেশের রাজাও এই পুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অংশীদার হতেন। অবশ্য সরকারের প্রকৃত লাভ ছিল এই যে, ব্রাহ্মণের চেষ্টায় পতিত জমিখণ্ড আবাদ হলে পার্শ্ববর্তী পতিত জমির দাম বেড়ে যেত। আবার কোনও কোনও কারণে নিষ্কর ঐ আবাদী জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবারও সম্ভবনা ঘটত; যেমন ভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যেতেন অথবা তিনি যদি রাজদ্রোহের মত কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী হতেন।

দীনার গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা, ওজনে ১২৪ গ্রেন। নামটি রোমান **Denarius**-এর ভারতীয় রূপ। রোমান মুদ্রার অনুকরণে ভারতের কুষাণ বংশীয় রাজগণ ১২৪ গ্রেন ওজনের এইরূপ স্বর্ণমুদ্রার প্রথম প্রচলন করেন। ৩২ আঢ়বাপ বা ৮ দ্রোণবাপে ১ কুল্যবাপ ভূমির পরিমাপ গণিত হত। এক আঢ়ক, দ্রোণ বা কুল্য ওজনের ধান্যবীজ যতটা ভূমিতে বপন করা যেত, তার পরিমাপ ছিল এক আঢ়বাপ, দ্রোণবাপ অথবা কুল্যবাপ। ২৫৬ মুষ্টি ধান্যে এক আঢ়ক হত; তার চতুর্গুণ দ্রোণ এবং দ্রোণের অষ্টগুণ কুল্য।

বুধগুপ্তের আমলের অপর দামোদরপুর শাসনে দেখা যায়, কোটিবর্ষ নগরের (বর্তমান পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের) পঞ্চায়েত সভার প্রধান নগরশ্রেষ্ঠী ঋভুপালের আবেদনক্রমে তাঁর কাছ থেকে মূল্য নিয়ে তাঁকে কিছু সরকারী পতিত জমি নিষ্কর শর্তে বিক্রয় করা হয়। কিছুকাল পূর্বে ঋভুপাল হিমালয়ের (অর্থাৎ নেপালের কৌশিকী ও কোকা নদীর সঙ্গমস্থিত বরাহক্ষেত্রের) কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামী নামক দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ডোঙ্গা গ্রামে যথাক্রমে ৪ এবং ৭— মোট এই ১১ কুল্যবাপ পতিত ভূমি কিনে নিষ্কর দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন তিনি সেই ভূমির সন্নিকটে ঐ দুই দেবতার জন্য একটি করে মন্দির এবং কোষ্ঠাগার নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরও পতিত জমি কিনলেন। শাসনটি থেকে মনে হয়, দিনাজপুর অঞ্চলবাসী ঋভুপাল বরাহক্ষেত্রে তীর্থ করতে যান এবং প্রত্যাবর্তনের

পর স্বদেশে তীর্থস্থানের দুইজন দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমি দান করেন। কিন্তু পরে প্রদত্ত ভূমির আয় নেপালে প্রেরণের অসুবিধা বুঝে তিনি ভূমির নিকটেই দুই দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের ভোগের জন্য পূর্ব প্রদত্ত ভূমি পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরাতন দেবতার স্থান থেকে দূরে তাঁর নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে আরও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। পুরীর পুরুষোত্তম জগন্নাথ গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১-৩৯ খ্রী) ইষ্টদেবতা ছিলেন ; রাজা তাঁর রাজধানী কটকে মন্দির নির্মাণ করে ঐ দেবতার নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। আদি মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

প্রাচীন মগধদেশ আধুনিক বিহারের দক্ষিণাংশে পাটনা-গয়া অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল। প্রথমে এদেশের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ নগর। কিংবদন্তী অনুসারে মগধরাজ জরাসন্ধ গিরিব্রজে বাস করতেন। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে হর্যঙ্কবংশীয় বিম্বিসার (আ ৫৪৬-৪৯৪ খ্রী-পূ) মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভগবান্ বুদ্ধের সমসমায়িক। একখানি প্রাচীন লেখ অনুসারে বুদ্ধের জীবনকাল ৫৬৬-৪৮৬ খ্রী-পূ, যদিও শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তী অনুসারে ৬২৪-৫৪৪ খ্রী-পূ বুদ্ধের জীবনকাল বলে উল্লিখিত হয়। রাজা বিম্বিসার গিরিব্রজের উপকণ্ঠে রাজগৃহ নগর স্থাপন করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বিহারের বর্তমান নালন্দা জেলার অন্তর্গত রাজগির নামক স্থানে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল।

সেকালে ভারতে রাজ্য এবং গণরাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল অনেক। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধযুগের জনপদগুলির মধ্যে ষোলটিকে প্রধান বলা হয়েছে। মগধকে এই 'ষোড়শ মহাজনপদের' অন্যতম বলে গণ্য করা হত। বাকী পনেরটি মহাজনপদের নাম—

১। অঙ্গ (পূর্ব বিহারের মুঙ্গের-ভাগলপুর অঞ্চল, রাজধানী বর্তমান ভাগলপুরের উপকণ্ঠস্থিত চম্পানগরী)।

২। বৃজিগণরাষ্ট্র (উত্তর বিহারের তিরহুত অঞ্চল, রাজধানী বৈশালী যার আধুনিক উচ্চারণ 'বসাঢ়')।

৩। কাশি (রাজধানী বারাণসী)।

৪। কোসল (রাজধানী উত্তর-প্রদেশের গোণ্ডা ও বহরাইচ জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত শ্রাবস্তী, অর্থাৎ আধুনিক সেত বা সহেত এবং মহেত নামক গ্রামদ্বয়; রামায়ণে উল্লিখিত রাজধানী ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত 'অযোধ্যা')।

৫। বৎস (রাজধানী এলাহাবাদ থেকে ৩৫ মাইল দূরবর্তী যমুনা তীরস্থিত কৌশাম্বী, বর্তমান কোসাম)।

৬। পঞ্চাল (উত্তর-পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্র বর্তমান বরেলী জেলার অন্তর্গত রামনগর; দক্ষিণ-পঞ্চালের রাজধানী 'কাম্পীল্য' আধুনিক ফররুখাবাদ জেলার কাম্পীল)।

৭। কুরু (রাজধানী মেরাঠ জেলায় অবস্থিত হস্তিনাপুর; কখনও বা বর্তমান দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ, আধুনিক উচ্চারণে 'ইন্দরপত')।

৮। শূরসেন (রাজধানী মথুরা)।

৯। মল্লগণরাষ্ট্র (রাজধানী উত্তর প্রদেশের দেওড়িয়া জেলার অন্তর্গত কুশীনারা ও পাবা)।

১০। চেদি (রাজধানী যমুনার দক্ষিণ দিকের কেন নামক উপনদীর তীরস্থিত শুক্তিমতী নগরী)।

১১। অশ্মক (বর্তমান মহারাষ্ট্রের নান্দেড় এবং আন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ অঞ্চল; রাজধানী পোদন্য অর্থাৎ নিজামাবাদের অন্তর্গত বোধন)।

১২। অবন্তি (রাজধানী বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী)।

১৩। মৎস্য (আধুনিক জয়পুর, আলোয়ার এবং ভরতপুর অঞ্চল; রাজধানী বিরাটনগর অর্থাৎ জয়পুরের অন্তর্গত বৈরাট)।

১৪। গন্ধার (রাজধানী বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির

নিকটবর্তী তক্ষশিলা এবং পেশোয়ারের নিকটবর্তী পুষ্কলাবতী অর্থাৎ আধুনিক চারসাদ্দা)।

১৫। কম্বোজ (ইরান থেকে আগত কম্বোজগণের পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কতকগুলি অঞ্চলে স্থাপিত উপনিবেশ; সম্ভবতঃ এই কম্বোজ দেশের রাজধানী ছিল আধুনিক কান্দাহারের নিকটে)।

পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে শীঘ্রই ষোলটি মহাজনপদের কতকগুলি লোপ পায়। বুদ্ধের যুগেই মগধরাজ বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য এবং কোসলরাজ প্রসেনজিৎ কাশিরাজ্য অধিকার করে শক্তিশালী হন। অপর রাজ্যগুলির মধ্যে অবন্তির প্রদ্যোত এবং বৎসের উদয়ন আপন আপন রাজ্য বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে বৎসরাজ্য অবন্তি কর্তৃক অধিকৃত হয়। এদিকে বিম্বিসার দ্বারা অঙ্গরাজ্য অধিকারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু (আ ৪৯৪-৪৬২ খ্রী-পূ) উত্তর-বিহারের বৃজিগণরাষ্ট্র অধিকার করেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের পর তিনি কোসল রাজ্যের অন্তর্গত কাশির কিয়দংশেরও অধিকার লাভ করেছিলেন। বৈশালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমে অবস্থিত পাটলি গ্রামে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র উদয়ী (আ ৪৬২-৪৪৬ খ্রী-পূ) তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে ঐ স্থানে পাটলিপুত্র নগর নির্মাণ করে সেখানে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বর্ধিতায়তন মগধ রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে পাটলিপুত্র থেকে রাজ্যশাসন অনেকটা সুবিধাজনক হল। এই সময়েই কোসল-রাজ্যে মগধের অধিকার প্রসারিত হয়। ফলে উত্তর-ভারতের আধিপত্যের জন্য পূর্ব-ভারতের মগধ এবং পশ্চিম-ভারতের অবন্তি—এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল।

কালক্রমে হর্যঙ্কবংশের শেষ রাজার অমাত্য এবং বারাণসীর শাসনকর্তা শিশুনাগ (আ ৪১৪-৩৯৬ খ্রী-পূ) মগধের সিংহাসন লাভ করেন। প্রদ্যোতবংশ ধ্বংস করে অবন্তিরাজ্য অধিকার তাঁর অসাধারণ

কৃতিত্ব। এর ফলে মগধসাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অল্পকাল পরেই মগধের সিংহাসন নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের করতলগত হয়। সমসাময়িক রাজবংশগুলিকে উৎখাত করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সুবিস্তৃত অঞ্চলে মহাপদ্ম মগধসাম্রাজ্যের অধিকার প্রসারিত করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের রাজত্বকালে মাসিডনের দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট্ আলেকজান্দার (৩৩৬-৩২৩ খ্রী-পূ) খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৭ অব্দে বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চল আক্রমণ করেন। প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকগণ এই নন্দসম্রাটের রাজধানীর নাম বলেছেন **Palimbothra** (পাটলিপুত্র) এবং তাঁকে **Prasioi** (প্রাচ্য) ও **Gangaridai** (গাঙ্গেয়) জাতিদ্বয়ের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করেছেন। কখনও বা তাঁকে কেবল **Gangaridai** জাতির অধিপতি রূপে উল্লিখিত দেখা যায়। **Gangaridai** শব্দটি **Gangarid** অর্থাৎ গাঙ্গেয় শব্দের বহুবচন। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণভাগের নাম ছিল দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ, উত্তর-ভারতের মধ্যভাগে ছিল মধ্যদেশ এবং তার পূর্বে প্রাচ্য বা পূর্বদেশ, পশ্চিমে অপরান্ত, প্রতীচ্য বা পশ্চাদ্দেশ এবং উত্তর ও পশ্চিমোত্তরে উদীচ্য বা উত্তরাপথ। প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যে **Gangarid** বা গাঙ্গেয় জাতিকে দক্ষিণ-বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের অর্থাৎ গঙ্গানদীর মোহনাবিধৌত জনপদের অধিবাসী বলা হয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ঠিক ঐ অঞ্চলেই বঙ্গজাতির অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যে যে জাতিকে বঙ্গ বলা হয়েছে, সেই জাতিকেই প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকগণ **Gangarid** বলেছেন বলে বোঝা যায়।

এই **Gangarid** বা বঙ্গগণ একটি 'প্রাচ্য' জাতি, কিন্তু তাদের প্রাচ্যদের পাশাপাশি একসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের কারণ অনুমান করা কঠিন। স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা **Gangarid** জাতিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এর কারণ হয়ত এই যে, নন্দরাজগণ **Gangarid** বা বঙ্গজাতীয় ছিলেন।

আলেকজান্দার সংবাদ পেয়েছিলেন যে, পাটলিপুত্ররাজের বিশাল সেনাবাহিনী তাঁকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে। তাই তাঁর সৈন্যগণ বিপাশা নদী অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে সাহস পেল না। নন্দসাম্রাজ্যের পশ্চিমোত্তর সীমা তখন মোটামুটি বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা নন্দরাজের সেনাবাহিনীর বিশালতার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন, দুই লক্ষ পদাতি, বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার চারঘোড়ার রথ এবং তিন হাজার হস্তীর কথা। কেউ কেউ আবার হস্তীর সংখ্যা বলেছেন চার হাজার অথবা ছয় হাজার।

৪। মৌর্যবংশের অভ্যুদয়

খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বালুচিস্তান ও মাকরানের পথে বাবিলন অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ইরানের হখামনীষীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে ঐ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষস্থিত অংশ জয় করতে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তিনি অনেকগুলি নবনির্মিত নগরে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন করে আপন অধিকার স্থায়ী করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর চেষ্টা বিফল হয়ে গেল।

আলেকজান্দারের ভারত ত্যাগের অল্পকাল পরেই মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (আ ৩২৪-৩০০ খ্রী-পূ) নন্দরাজকে উৎখাত করে কলিঙ্গ দেশ ব্যতীত সমগ্র মগধসাম্রাজ্য অধিকার করেন। মৌর্যগণ লিচ্ছবি, শাক্য প্রভৃতি জাতির ন্যায় হিমালয় অঞ্চলের মোঙ্গোল গোষ্ঠীভুক্ত জাতিবিশেষ। এইসকল জাতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আর্য ভাষা অবলম্বন করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করত; কিন্তু সমাজনায়ক ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় এদের শূদ্র বা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলতেন।

চন্দ্রগুপ্ত একজন উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি এবং রাজনীতিবিদ্ ছিলেন।

তিনি যে কেবল নন্দসাম্রাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই নয়। আলেকজান্দার কর্তৃক বিজিত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অনেক অঞ্চল থেকে তিনি গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করে মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে সেলেউকস নিকাতোর নামক তাঁর জনৈক সেনাপতি পশ্চিম-এশিয়ার আধিপত্য পেয়ে খ্রী-পূ ৩১১ অব্দে বাবিলনে অধিষ্ঠিত হন। আনুমানিক ৩০৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যবন অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধের ফল সেলেউকসের পক্ষে শুভ হয় নি। কারণ ৫০০ হস্তীর বিনিময়ে তিনি আফগানিস্তানের হেরাত (Aria), কান্দাহার (Arachosia) ও কাবুল (Paropamisadae) জনপদ এবং বালুচিস্তান-মাকরান (Gedrosia) অঞ্চলের অধিকাংশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিয়ে মৌর্যরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধিসূত্রে চন্দ্রগুপ্ত সেলেউকস-বংশীয়া কোন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন বলে মনে হয়। সম্প্রতি কান্দাহারে এবং পূর্ব-আফগানিস্তানের কোন কোন স্থানে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ দেশে মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তর আফগানিস্তানের বাহ্লীক দেশে যবন অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। মেগাস্থেনিস নামক দূত সেলেউকসের কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এসেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানির কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তবে উত্তরকালীন লেখকগণের উদ্ধৃতি থেকে যবন-দূতের ভারত-সম্পর্কিত অনেক মতামত জানতে পারা যায়। তিনি বলেছেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত ছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। এই রাজকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বিশাল সেনাবলের উপর নির্ভরশীল ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সেনাদলে ছিল ৬,০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৩৬,০০০ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত ৯,০০০ হস্তী এবং বহু সহস্র রথ। তখন মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত এবং পূর্বে বাংলা-

দেশ থেকে পশ্চিমে আরবসাগর ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রুদ্রদামার গিরনার প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রিয় (শাসনকর্তা) বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত সুরাষ্ট্রের রাজধানী গিরিনগর (আধুনিক জুনাগড়) হতে ঐ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে জৈনধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত কর্ণাটকের অন্তর্গত শ্রবণ বেলগোলাতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার (আ ৩০০-২৭২ খ্রী-পূ) পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহন করেন। যবনেরা তাঁকে Amitrochates (অমিত্রঘাত) বলত। কথিত আছে, তিনি সেলেউকসের উত্তরাধিকারী প্রথম Antiochus-এর কাছে কিছু উৎকৃষ্ট সুরা ও ফল এবং একজন যবন দার্শনিক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিন্দুসার বৈদেশিক রাজগণের সঙ্গে প্রীতিরক্ষা করে চলছিলেন এবং দার্শনিক আলোচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল।

৫। রাজর্ষি অশোক (আ ২৭২-২৩২ খ্রী-পূ)

আনুমানিক ২৭২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে রাজা বিন্দুসার পরলোক গমন করলে তাঁর ভুবন-বিখ্যাত পুত্র অশোক মৌর্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু চার বৎসর কাল সিংহাসন নিয়ে বিবাদের ফলে তাঁর অভিষেক কার্য সম্পন্ন হয় নি। তাই অশোকের ৩৭ বৎসর ব্যাপী রাজত্ব কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৬৯ অব্দ থেকে গণনা করা হয়। অশোকের সাম্রাজ্য তাঁর পিতা এবং পিতামহের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও বৃহৎ ছিল; কারণ তিনি উড়িষ্যা এবং আন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কলিঙ্গরাজ্য অধিকার করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনচাঙ্ বাংলা দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিগ্‌ভাগের পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ দেশে অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন; কিন্তু কামরূপ বা আসামে তাঁর কোন কীর্তি দেখতে পান নি। তাই বর্তমান আসাম অশোকের সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল বলে মনে হয়। আবার দক্ষিণ-

দিকে চীন পরিব্রাজক মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্চীপুরে অশোকনির্মিত স্তূপ দেখেছিলেন। ঐ অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল বলে মনে করা যায়। অশোকের অনুশাসন সমূহের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের আয়তন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। ভারতীয় সাহিত্যে অশোক সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অশোকানুশাসনের সাক্ষ্য মেলালে মৌর্য সম্রাটের কীর্তিকলাপের এক জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে। অশোকের অনুশাসনে সাধারণতঃ তাঁর নাম 'দেবানাম্প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় যে রাজা সকলকে সুদৃষ্টিতে দেখেন। কখনও বা রাজাকে শুধু 'দেবানাম্প্রিয়' অথবা 'প্রিয়দর্শী' বলা হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের কিংবদন্তীতে অশোককে কখনও প্রিয়দর্শী বা প্রিয়দর্শন নামে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত অনুশাসনগুলি ঠিক অশোকের কিনা সে বিষয়ে কারও কারও সন্দেহ ছিল। প্রথম ১৯১৫ সালে কর্ণাটকের মাসকিতে প্রাপ্ত প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের পাঠে অশোকের নাম পাওয়া গেল। প্রায় ৪০ বৎসর পরে মধ্যপ্রদেশের গুজর্রাতেও ঐ শাসনের পাঠে অশোকরাজ নাম দেখা যায়। সম্প্রতি কর্ণাটকের নিট্টুর এবং উডেগোলম নামক দুই গ্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনের যে পাঠ পাওয়া গিয়েছে, তাতে কয়েকবার অশোকের ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ আছে। কিংবদন্তীতে অশোকের নামের পূর্ণরূপ পাওয়া যায় অশোকবর্ধন। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীর পল্লব বংশের রাজশাসনে নামটি অশোক বা অশোকবর্মা দেখা যায়।

অশোকের লেখমালায় একবার তাঁকে 'মাগধ রাজা' অর্থাৎ মগধের অধিপতি বলা হয়েছে। মগধ ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশ। অনুশাসনে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 'ইধ' বা 'হিদ' (সংস্কৃত 'ইহ', অর্থাৎ 'এখানে') শব্দ দ্বারা রাজার গৃহ, রাজধানী অথবা সাম্রাজ্য বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কখনও বা অশোকের 'বিজিত' বা সাম্রাজ্যকে বলা হয়েছে 'জম্বুদ্বীপ'

কিংবা 'পৃথিবী'। ভারতবর্ষে রাজচক্রবর্তীদের 'পৃথিবীর অধীশ্বর' বলার প্রথা প্রাচীন। জম্বুদ্বীপ বলতে 'পৃথিবী' অথবা পৃথিবীর যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত সেই অংশটি বোঝাত।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অপর যে সকল নগরের উল্লেখ লেখমালায় পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা, সুবর্ণগিরি, তোসলী, কৌশাম্বী, সমাপা এবং ইসিল বা ঋষিল। এর মধ্যে প্রথম চারটি ছিল প্রাদেশিক রাজধানী। রাজবংশীয় কুমারগণ ঐ নগরগুলি থেকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসন পরিচালনা করতেন। পাটলিপুত্র থেকে সম্ভবতঃ প্রাচ্য ও মধ্যদেশের শাসনকার্য পরিচালন করা হত। আধুনিক হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বাংলা এই ভূখণ্ডদ্বয়ের অন্তর্গত ছিল বলে বোধ হয়। উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা এবং সুবর্ণগিরি (আন্ধ্রপ্রদেশের কার্নুল জেলার অন্তর্গত এড়্ড়গুডির নিকটবর্তী জোন্নগিরি) বোধহয় পশ্চিম দিকের অপরান্ত (পশ্চাদ্দেশ), পশ্চিমোত্তর ও উত্তরের উত্তরাপথ এবং দক্ষিণ দিকের দাক্ষিণাত্য—এই প্রদেশত্রয়ের শাসনকেন্দ্র ছিল। তোসলী (উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী ধৌলি) এবং সমাপা (গঞ্জাম জেলার জৌগড়ার সংলগ্ন নগরী) থেকে অশোকের কর্মচারীদের দ্বারা বিজিত কলিঙ্গ দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হত। কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি ও শিদ্দাপুরা (প্রাচীন ঋষিল বা ইসিল) একটি স্থানীয় শাসনকেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ রুদ্রদামার গির্নার লেখ থেকে জানা যায় যে, যবন (গ্রীক) জাতীয় তুষাস্ফ নামক রাজা অশোকের সময় সুরাষ্ট্রের শাসকরূপে গিরিনগরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বোধহয় উজ্জয়িনীর শাসনকর্তার অধীন ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে অশোক নিজেও তাঁর পিতা বিন্দুসারের আমলে উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলায় শাসনকর্তা ছিলেন। লেখমালাতে দেখা যায়, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অশোক কতিপয় বৌদ্ধতীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তন্মধ্যে দুটি হচ্ছে নেপালের তরাইয়ে অবস্থিত ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রাম এবং তাঁর বোধিলাভক্ষেত্র বিহারের অন্তর্গত সম্বোধি অর্থাৎ মহাবোধি বা বোধগয়া।

অশোকের লেখাবলীতে মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত নিম্নলিখিত জাতিগুলির উল্লেখ আছে।—

১। যবন বা গ্রীক। বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নানা জায়গায় এদের উপনিবেশ ছিল। কান্দাহার অর্থাৎ প্রাচীন Alexandria বা ইস্কান্দারিয়াতে গ্রীক ভাষাতে লিখিত অশোকের অনুশাসন তাঁর যবনজাতীয় প্রজাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছিল।

২। কম্বোজ। এরা প্রাচীন ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট ইরানীয় জাতি। এদেরও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নানা উপনিবেশ ছিল। কান্দাহার, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে অশোকের যে আরামায়িক ভাষায় লিখিত অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি তাঁর কম্বোজজাতীয় প্রজাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছিল।

৩। ভোজ। সম্ভবতঃ ভোজেরা আধুনিক বেরার অঞ্চলে বাস করত। 'ভোজ' বা 'ভোজক' শব্দে জায়গীরদার বোঝাত। তাই ভোজ জাতিকে বোঝাবার জন্য অশোকানুশাসনে স্পষ্ট করে এদের 'পৈত্র্যণিক' অর্থাৎ বংশানুক্রমিক বলা হয়েছে।

৪। রাষ্ট্রিক। এদেরও বলা হয়েছে 'পৈত্র্যণিক' বা বংশানুক্রমিক। কারণ জাতিবিশেষ ব্যতীত 'রাষ্ট্রিক' শব্দে পরগনার শাসক বোঝাত। রাষ্ট্রিক জাতিও বেরার অঞ্চলে বাস করত বলে মনে হয়।

৫। অন্ধ্র। এরা বোধহয় মৌর্যযুগে দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চলে বাস করত। পরবর্তী কালে অন্ধ্রজাতীয় শাতবাহন রাজবংশের রাজধানী ছিল ঔরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান বা পৈঠন। তেলুগুভাষীরা এখন নিজেদের দেশকে 'আন্ধ্রপ্রদেশ' বলে।

৬। পুলিন্দ বা পৌলিন্দ। এরা অন্ধ্রজাতির কাছাকাছি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে বাস করত।

৭। নাভক। এদের অবস্থান কোথায় ছিল, তা নিশ্চিত জানা যায় না।

৮। নাভপঙ্‌ক্তি। এদের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

অশোকের লেখাবলীতে তিনি কখনও কখনও তাঁর সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত কিছু জাতি বা জনপদের উল্লেখ করেছেন। এদের অন্ত বা প্রত্যন্ত বলা হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্ত বা প্রত্যন্তের নাম বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যের দক্ষিণে ছিল—

(১) চোড বা চোল জাতি। এরা বর্তমান তামিলনাডুর তাঞ্জাবুর ও তিরুচিরাপল্লি জেলায় বাস করত। এদের রাজধানী ছিল তিরুচিরাপল্লি নগরীর নিকটবর্তী উরৈয়ুর।

(২) পাণ্ড্য জাতি। এরা আধুনিক মাদুরৈ, রামনাথপুরম্ এবং তিরুনেলবেলি অঞ্চলে বাস করত। মাদুরৈ অর্থাৎ মথুরা বা দক্ষিণ মথুরা এদের রাজধানী ছিল।

(৩) কেরলপুত্র। এটি কেরল দেশের রাজার উপাধিবিশেষ।

(৪) সাতিয়পুত্র। এটি সাতিয় দেশের রাজার উপাধি। এই দেশটির সংস্কৃত নাম বোধহয় 'শাস্তিক'। সম্ভবতঃ দেশটি কেরলের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল।

(৫) তাম্রপর্ণী। এটির অবস্থান ছিল পূর্বোল্লিখিত চারটি জনপদের দক্ষিণে। আধুনিক শ্রীলঙ্কার প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী।

এইরূপ সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের পাঁচটি গ্রীক রাজ্যের রাজগণেরও উল্লেখ আছে।—

১। অন্তিয়োক অর্থাৎ পশ্চিম-এশিয়ার সেলেউকস বংশীয় দ্বিতীয় Antiochus Theos (২৬১-২৪৬ খ্রী-পূ)।

২। তুরমায় বা তুলমায় অর্থাৎ মিশরের রাজা দ্বিতীয় Ptolemy Philadelphus (২৮৫-২৪৭ খ্রী-পূ)।

৩। অন্তিকিনি বা অন্তেকিনি অর্থাৎ মাসিডোনিয়ার অধিপতি Antigonas Gonatas (২৭৭-২৩৯ খ্রী-পূ)।

৪। মকা বা মগা অর্থাৎ উত্তর অফ্রিকার কাইরেনি (Cyrene) দেশের রাজা Magas (২৮২-২৫৮ খ্রী-পূ)।

৫। অলিকসুদর (অলিকসুন্দর) অর্থাৎ এপিরসের রাজা

Alexander (২৭২-২৫৫ খ্রী-পূ) অথবা করিন্থের রাজা Alexander (২৫২-২৪৪ খ্রী-পূ)।

অশোকের শাসনাবলীতে মহামাত্র-সংজ্ঞক এক উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ দেখা যায়। তাঁদের নানা রকমের দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োগ করা হত। অনেক সময় তাঁরা কোনও নগরের বিচার-বিভাগ পরিচালনা, রাজান্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের সমস্যা, সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের শাসন প্রভৃতি কার্যের ভার পেতেন। অশোকের শাসন ব্যবস্থায় ধর্মসম্বন্ধীয় বিভাগের পরিচালনাভার যেসকল মহামাত্রের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁদের বলা হত ধর্মমহামাত্র। অশোক বলেছেন যে, ধর্মমহামাত্রের পদ তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন। সেকালে সকল রাজারই দানধর্মের একটি বিভাগ থাকত। তাই মনে হয়, অশোকের পূর্ববর্তী মগধরাজগণের ধর্মবিভাগ মহামাত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হত। অশোকের দূতগণ বোধহয় অন্ত-মহামাত্র শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। অনুশাসনে আর যে সকল উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছেন প্রাদেশিক, রজ্জুক এবং রাষ্ট্রিক। এঁরা সম্ভবতঃ যথাক্রমে প্রদেশ, জেলা এবং পরগনার শাসনকর্তা ছিলেন। কেউ কেউ অনুশাসনে উল্লিখিত 'যুক্ত' শব্দে পরগনার শাসক বুঝেছেন। তবে 'যুক্ত' শব্দে সাধারণভাবে 'কর্মচারী' বোঝাতে পারে। এক উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীকে 'পুরুষ' অর্থাৎ রাজপুরুষ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বিশেষরূপে নিযুক্ত কর্মচারী ছিলেন বলে বোধ হয়। সম্রাটের গোশালা, গোচরভূমি প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল ব্রজভূমিক-সংজ্ঞক উচ্চ কর্মচারীর উপর। প্রতিবেদক বা চরগণ মধ্যমশ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিলেন। সম্ভবতঃ লিপিকর বা লেখক ছিলেন নিম্ন-শ্রেণার কর্মচারী।

৬। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

অশোকানুশাসনের প্রধান বিষয় তাঁর ধর্ম। তৃতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনে 'ধর্ম' শব্দটি ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু অন্যত্র তিনি 'ধর্ম' বলতে সকল ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই পালনীয় কতকগুলি নীতি বুঝেছেন। সম্ভবতঃ অশোক এগুলিকে ভগবান্ বুদ্ধের বাণী বলে বিশ্বাস করতেন। শৃগাল নামক গৃহস্থপুত্রের প্রতি বুদ্ধের যে উপদেশ পালি দীঘনিকায় (দীর্ঘনিকায়) সংজ্ঞক প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়, অশোকের ধর্মবিষয়ক উপদেশের সঙ্গে তার খানিকটা মিল আছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত—ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে, অশোক উপাসক হিসাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের একজন প্রবল পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাজধানী পাটলিপুত্রে অশোকারাম নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরে তিনি ৮৪০০০ বৌদ্ধস্তূপ বা বিহার নির্মাণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। অশোক যে উপাসক হিসাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে-ছিলেন, তাঁর অনুশাসনগুলি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

অশোকের লেখাবলীতে কয়েক স্থানে বুদ্ধকে ভগবান্ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার এক স্থলে বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মমতকে 'সদ্ধর্ম' অর্থাৎ সত্যধর্ম বলা হয়েছে। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনে অশোক বলেছেন যে, তাঁর উপাসকত্ব গ্রহণের আড়াই বৎসরেরও বেশী সময় পরে শাসনটি প্রচারিত হয়েছিল ; কিন্তু তার মধ্যে বৎসরাধিক কাল তিনি ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। লেখটিতে আরও বলা হয়েছে যে, ঐ শাসন প্রচারের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে তিনি সংঘ অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। তৃতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনে তিনি কেবল বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের প্রতি তাঁর গৌরব এবং প্রসাদের (অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির) কথা বলেছেন, তাই নয়। তিনি আরও বলেছেন যে, যা কিছু ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, সে সমস্তই অত্যুত্তম বাণী। এমন কি তিনি ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা —এই সকল শ্রেণীর বৌদ্ধগণেরই চর্চার জন্য কতকগুলি বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক নির্ধারিত করে দেন। বলা হয়েছে যে, সত্যধর্মকে চিরস্থায়ী করাই

তাঁর এই কার্যের উদ্দেশ্য। প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনে দেখা যায়, কিভাবে ঐ একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে অশোক প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ থেকে বিতাড়নের জন্য মহামাত্রদিগকে আদেশ দিয়েছিলেন। পালি বৌদ্ধ-সাহিত্যে অশোকের বৌদ্ধসংঘের এই সংহতি রক্ষার প্রচেষ্টার উল্লেখ আছে। অষ্টম মুখ্য গিরিশাসন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভ-লেখে দেখতে পাই, অশোক বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রাম ও বোধিলাভ ক্ষেত্র সম্বোধি (মহাবোধি বা বোধগয়া) এবং পূর্ববুদ্ধ কনক-মুনির স্তূপ প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থে পর্যটন করেছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তাই প্রথম যুগের বৌদ্ধগণ বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেন নাই। ক্রমে চিহ্নবিশেষ দ্বারা বুদ্ধকে বোঝানোর প্রথা প্রচলিত হয়। এই চিহ্নসমূহের মধ্যে আদিযুগের শিল্পে হস্তীর স্থান প্রধান। কাল্সী এবং ধৌলিতে পর্বতগাত্রে যেখানে অশোকের লেখাবলী উৎকীর্ণ হয়েছে, সেখানে হস্তীর মূর্তিও ক্ষোদিত আছে। এই হস্তীকে কাল্সীতে বলা হয়েছে 'গজতমে' (সংস্কৃত 'গজতমঃ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হস্তী) এবং ধৌলিতে 'স্বেতো' (সংস্কৃত 'শ্বেতঃ' অর্থাৎ শ্বেতহস্তী)। গিরনারের পর্বতগাত্রে অশোকের অনুশাসনমালার নিকট হস্তীর মূর্তিটির অস্তিত্ব নেই; কিন্তু তার পরিচয়জ্ঞাপক লেখটিতে আছে—'সর্বশ্বেতো হস্তি সর্বলোক-সুখাহরো নাম' অর্থাৎ 'সমস্ত জগতের সুখের বাহক—এই নামধারী সর্বশ্বেত হস্তী'। আহ্রৌরা অনুশাসনে বুদ্ধের দেহাবশেষ মঞ্চস্থ করার উল্লেখ আছে।

কথিত আছে যে, প্রথম জীবনে অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং নিরানব্বই জন ভ্রাতার প্রাণসংহার ইত্যাদি বহুসংখ্যক নির্দয় কার্যের জন্য লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'চণ্ডাশোক'; কিন্তু উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের ফলে তাঁর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় এবং নানা সৎকার্যের জন্য তখন তাঁর নাম হয় 'ধর্মাশোক'। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, কাহিনীটি বৌদ্ধ লেখকদের স্বকপোল-

কল্পিত। কারণ এর উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃই মনুষ্যচরিত্রের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের মাহাত্ম্যকীর্তন। অবশ্য বৌদ্ধেরা অশোকের সত্যধর্ম গ্রহণের ফল অতিরঞ্জিত করতে পারেন, এবং নিরানব্বই জন ভ্রাতার হত্যা-কাহিনী মিথ্যা রটনা হতে পারে। কিন্তু তাঁর অষ্টম গিরিশাসনের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর অর্থাৎ নবম রাজ্য-সংবৎসরে অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করেন এবং তারপর ধীরে ধীরে তিনি যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষে পরিবর্তিত হন। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনাবলী অশোকের মনে এমন গভীর রেখাপাত করে যে, তিনি যাতে এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন, সেই ভারতীয় রাজগণের সাধারণ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে এখন একজন সাধু এবং সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম-প্রচারকের পবিত্র জীবনযাত্রা অবলম্বন করেন। ইতিপূর্বে অশোকের রন্ধনশালায় ব্যঞ্জনের জন্য অগণিত পশু-পক্ষী হত্যা করা হত; এখন তার স্থলে মাত্র একটি পশু ও দুটি পক্ষী হত্যা করা হতে লাগল এবং স্থির হল যে, পরে ব্যঞ্জনের জন্য জীবহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। রাজগণের চিরাচরিত মৃগয়া-যাত্রা বন্ধ করে অশোক এখন ধর্মযাত্রা অর্থাৎ তীর্থপর্যটন আরম্ভ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ (বৌদ্ধ সাধু) এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে এসে দানাদির এবং গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেতেন। তাঁর আদেশে রাজকর্মচারীদিগকেও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ করতে হত। তিনি নিজে যুদ্ধ করে দেশজয়ের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। এমন কি তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতিও তাঁর অনুরোধ ছিল যে, তাঁরা যেন যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা দেশজয়ের পন্থা ত্যাগ করে প্রেম, সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা নিকটবর্তী দেশসমূহের অধিবাসীর হৃদয় জয়ের পথ অবলম্বন করেন এবং এইরূপ জয়কে প্রকৃত দেশজয় মনে করেন। এইরূপ দেশজয়কে অশোক 'ধর্মবিজয়' আখ্যা দিয়েছিলেন। পার্শ্ববর্তী দেশগুলির অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করতেন যে, তারা যেন তাঁর কাছ থেকে কোনরূপ দুঃখ পাবার ভয় না করে। যেসব

অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, তাদের সে রকম অপরাধও তিনি অবশ্য ক্ষমা করবেন বলে ঘোষিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেন সকল মানুষ তাঁর ধর্মের নিয়মাবলী পালন করে। তিনি বলতেন যে, সকল মনুষ্য তাঁর সন্তান।

অশোক কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না; তাঁর জন্যই পূর্বভারতের একটি স্থানীয় সাম্প্রদায়িক ধর্মমত হয়েও ঐ ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মমতে পরিণত হয়। কিন্তু অশোক তাঁর লেখাবলীর মাধ্যমে যে ধর্ম প্রচার করেছেন তার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যে বর্ণিত বৌদ্ধ মতবাদের মিল নেই। তিনি নির্বাণ, চারটি আর্যসত্য এবং আটটি মার্গ সম্পর্কে কোনও কথা বলেন নি। সকলেই জানেন যে, আর্যসত্যগুলি হচ্ছে—১) দুঃখ, ২) দুঃখের কারণ, ৩) দুঃখের নিরোধ এবং ৪) দুঃখনিরোধের উপায়। আর অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল— ১) সম্যক্ দৃষ্টি, ২) সম্যক্ সঙ্কল্প, ৩) সম্যক্ বাক্, ৪) সম্যক্ কর্মান্ত, ৫) সম্যক্ আজীব, ৬) সম্যক্ ব্যায়াম, ৭) সম্যক্ স্মৃতি এবং ৮) সম্যক্ সমাধি। এগুলির স্থলে অশোকানুশাসনে স্বর্গলাভ এবং পারলৌকিক সুখ মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলে ঘোষিত হয়েছে। অশোক কেবল যে বহুবার সংঘ, ভিক্ষু, শ্রমণ, ভিক্ষুণী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, তাই নয়; তিনি সর্বশ্রেণীর বৌদ্ধের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের সংহতি রক্ষা এবং সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বারবার বলেছেন যে, তাঁর কথিত ধর্মের নিয়মাবলী মেনে চললে এবং অন্যকে তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করলেই লোকের স্বর্গ এবং পারত্রিক সুখ লাভ হবে। বৌদ্ধ ধম্মপদ (ধর্মপদ) গ্রন্থের বুদ্ধমতের সঙ্গে অশোকের ধর্মের কিছু সাদৃশ্য আছে। কেউ কেউ ধম্মপদের বৌদ্ধধর্মকে ধর্মশাস্ত্রের বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা কিছু প্রাচীন বলে মনে করেন। কিন্তু ধম্মপদে নির্বাণের উল্লেখ আছে। তাই এই গ্রন্থ যদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হয়, তবে অশোকের ধর্ম আরও প্রাচীন বুদ্ধমত কিনা, সে কথা বিবেচ্য।
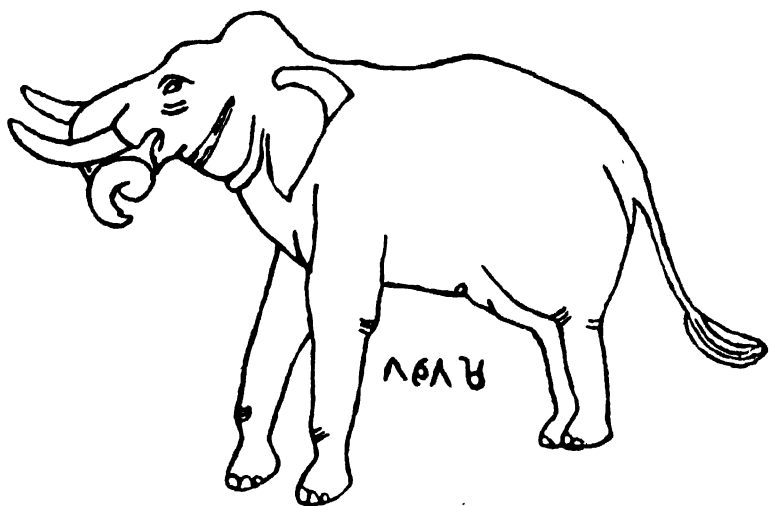
কাল্সীতে উৎকীর্ণ অনুশাসনসমূহের নিকটে ক্ষোদিত হস্তীর মূর্তি। পেটের নীচে ব্রাহ্মীতে লিখিত—গজতমে (সংস্কৃত—গজতমঃ অর্থাৎ গজোত্তম)। এখানে এই হস্তি-মূর্তি ভগবান্ বুদ্ধের প্রতীক।

(২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৭। অশোকানুশাসনের ধর্ম

অশোক যাকে ধর্ম বলেছেন, কতকগুলি সাধারণ নীতি মেনে চলাই তার ভিত্তি। তাতে কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতামতের বিশেষ কোনও রূপ প্রতিফলন দেখা যায় না।

যেসকল গুণকে অশোক তাঁর ধর্মের অঙ্গ বলে মানতেন, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—১) পাপের অল্পতা, ২) পরোপকারের আধিক্য, ৩) দয়া, ৪) দান, ৫) সত্য, ৬) শুচিতা, ৭) বিনীত ভাব এবং ৮) সাধু স্বভাব। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে—৯) সচ্চরিত্র, ১০) আত্ম-সংযম, ১১) মনোভাবের বিশুদ্ধি, ১২) কৃতজ্ঞতা, ১৩) দৃঢ়ভক্তি, ১৪) অহিংসা, ১৫) নিষ্ঠুরতার অভাব, ১৬) অক্রোধ, ১৭) মাৎসর্যাভাব এবং ১৮) দ্বেষশূন্যতা। এ ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর অশোক বার বার জোর দিয়েছেন—১৯) মাতাপিতার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের, গুরুজনের এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বাধ্যতা, ২০) বন্ধুজন, পরিচিত ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান, ২১) জীব-হত্যা ও জীবহিংসা পরিত্যাগ, ২২) অল্প ব্যয় এবং অল্প সঞ্চয়, ২৩) আত্মীয়-স্বজন, দাস ও ভৃত্য, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, বৃদ্ধ ও দরিদ্র এবং বিপদ্গ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, ২৪) গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ২৫) বন্ধু, পরিচিত, অনুগামী, আত্মীয়-স্বজন, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি ভদ্র ও অনুরাগযুক্ত ব্যবহার।

অশোক বলেছেন যে, এই ধর্ম অন্যের কাছে প্রচার করলে ধনী ও দরিদ্র সকলেই পুণ্যার্জন করবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং বাহিরে সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এই ধর্মের প্রচার তাঁর বাঞ্ছনীয় ছিল। অশোকের বিশ্বাস ছিল, এতে লোকের ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীত এ বিষয়ে ফললাভ সম্ভব নয়। তিনি এও বলেছেন, পাপের ভয়, ধর্মলাভের স্পৃহা ও উত্তম এবং আত্মপরীক্ষা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত সাফল্য অসম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, অশোক দয়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি,

সহৃদয়তা ও সত্যবাদিতাকে পুণ্যলাভের সহায় বলে বর্ণনা করেছেন এবং নিষ্ঠুরতা, শ্রদ্ধাহীনতা, অসহিষ্ণুতা ও মিথ্যাচারকে ধর্মের পরিপন্থী বলে প্রচার করেছেন। তিনি প্রাণনাশ এবং জীবহিংসার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। দান এবং শ্রদ্ধার পাত্রকে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনও অশোকের মতে অবশ্য-কর্তব্য কার্য। তিনি মনুষ্যের ন্যায় পশুদেরও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। সকলকে তিনি পশুগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। বহুসংখ্যক স্থলচর ও জলচর জীবজন্তু এবং পশুপক্ষীর হত্যা বিষয়ে তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছিলেন। রাজকীয় রন্ধনশালায় তিনি ব্যঞ্জনের জন্য পশুপক্ষীর হত্যা বিশেষ ভাবে কমিয়ে দেন। এমন কি, যে সকল সমাজ বা মেলাতে মাংসের খাদ্য বিক্রীত হত, তিনি সেগুলি বন্ধ করে দেন। অবশ্য যেসব মেলাতে ধর্মকথা এবং শাস্ত্রাদির আলোচনা হত তার অনুষ্ঠানে কোনও বাধা দেওয়া হয় নি।

প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনে অশোক বলেছেন যে, বৌদ্ধ উপাসক হবার পর কিছুকাল তিনি ধর্মব্যাপারে উদ্যমশীল ছিলেন না; পরে তিনি এ বিষয়ে উৎসাহী হলেন এবং কিঞ্চিদধিক এক বৎসরেই এর আশ্চর্যজনক ফল লাভ হল। পূর্বে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ অশোকের সাম্রাজ্যে মনুষ্যেরা দেবগণের সঙ্গে মিলিত ছিল না; কিন্তু ধর্মোদ্যমী অশোকের চেষ্টার ফলে মনুষ্য ও দেবতার মিলন ঘটল। এতে প্রাচীন ভারতীয়দের একটা বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করত যে, কোন মানুষের ধর্মভাব বৃদ্ধি পেলে সে যে কেবল মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে দেবগণের সঙ্গে মিলিত হয়, তাই নয়; এমন কি তার জীবনকালেই দেবতারা স্বর্গ থেকে এসে তার সঙ্গে আলাপ করেন। উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশের শাসনে সপ্তম শতাব্দীর রাজা অয়শোভীত মধ্যমরাজ সম্পর্কে এইরূপ উক্তি আছে। তাঁর ধর্ম-প্রবণতার জন্য স্বর্গত ঋষিগণ নাকি স্বর্গ থেকে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

অশোক কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্বদিনে পশুপক্ষীর হত্যা ও জীবহিংসা

নিষিদ্ধ করেন। এই পর্বদিনগুলি হল—১) তিনটি চাতুর্মাসী অর্থাৎ আষাঢ়, কার্তিক এবং ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা, ২) তিষ্যা বা পৌষ মাসের পূর্ণিমা, ৩) ঐ পূর্ণিমাগুলির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দিন দুটি এবং ৪) বৌদ্ধদের উপবাসের দিন অর্থাৎ প্রতি মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। তিষ্যা (পুষ্যা) ও পুনর্বসু নক্ষত্রকেও এ বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। তার কারণ বোধহয় এই যে, তিষ্যা নক্ষত্রে অশোক জন্ম লাভ করেছিলেন এবং পুনর্বসু তাঁর দেশের অর্থাৎ মগধের নক্ষত্ররূপে পরিগণিত হত। যাগযজ্ঞে পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়। তবে সেটা রাজপ্রাসাদে, রাজধানীতে কি মগধে তা নির্ণয় করা কঠিন। রাজপরিবারের সকলকেই তিনি উপযুক্ত লোককে দান করতে প্ররোচিত করতেন। তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনে অশোক তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর দ্বিতীয়া মহিষী অর্থাৎ তীবর-মাতা চারুবাকী যা কিছু দান করবেন সে সমস্তই যেন মহিষীর নিজের দান হিসাবে গণ্য করা হয়। কিংবদন্তী অনুসারে, রাজা অশোক তাঁর সর্বস্ব বৌদ্ধসংঘে দান করে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮। প্রজাপালক অশোকের আদর্শ

শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ কর হিসাবে গ্রহণের বিনিময়ে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ রাজার কর্তব্য, একথা প্রাচীন ভারতের রাজগণ মেনে চলতেন। অশোক প্রজার নিকটে রাজার এই ঋণের বিষয় অবহিত ছিলেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, তিনি প্রজাগণকে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী করতে আগ্রহী। তিনি এমন কথাও বলেছেন, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তাঁর সন্তান। তিনি শাসক হিসাবে সর্বস্থানে এবং সর্বকালে জনসাধারণের জন্য কাজ করবেন বলে ঘোষণা করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

যদিও অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি কখনও অন্য ধর্মের নিন্দা এবং পরধর্মাবলম্বীদের পীড়নের প্রশ্রয় দিতেন না। দ্বাদশ মুখ্য শিলাশাসনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাগণের প্রতি তাঁর অসাম্প্র-

দায়িক এবং নিরপেক্ষ মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন পার্ষদ অর্থাৎ পর্ষদ্ বা ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত জনগণকে সর্বত্র মিলেমিশে বাস করতে পরামর্শ দেন। কারণ কোন এক সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি অঞ্চলে সংখ্যাধিক হলে অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হবার ব্যাপারে প্ররোচিত হতে পারে। এক ধর্মের লোককে তিনি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ দিতেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা সমর্থন করেন নি। এ ব্যাপারে সকল সম্প্রদায়কেই তিনি বাক্‌সংযম অভ্যাস করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, পরধর্মকে সম্মান দেখালে ধর্মের গৌরব-বৃদ্ধি ঘটে এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়েরই উন্নতি হয়। অশোক ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের সারবৃদ্ধিই তাঁর কাম্য। তাঁর মতে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই আত্মসংযম এবং চিত্তশুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে। ষষ্ঠ মুখ্য স্তম্ভশাসনে বলা হয়েছে যে, অশোক সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোককেই সম্মান দেখাতে আগ্রহী। তিনি ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণের প্রতি ব্যবহারে কোনও পার্থক্য দেখান নি। পঞ্চম মুখ্য গিরিশাসন এবং সপ্তম মুখ্য স্তম্ভশাসন অনুসারে, অশোকের ধর্মমহামাত্রগণ সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গল এবং সুখের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, আজীবিক ও নিগ্রন্থ (জৈন) প্রভৃতির মধ্যে তারতম্য করতেন না। অশোক যে মত প্রচার করতেন, সেই মতবাদ যে তিনি স্বয়ং অনুসরণ করতেন, তারও প্রমাণ আছে। গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত কয়েকটি গুহা তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুদের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন।

একজন ধর্মপ্রচারকের পক্ষে পরধর্ম সম্বন্ধে এরূপ উদার মনোভাব জগতের ইতিহাসে বিরল। অশোক একাধারে সমদর্শী রাজা এবং উদারচেতা জননায়ক ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন।

৯। জনহিতকর কার্যকলাপ

মনুষ্যজাতিকে নিজের সন্তান মনে করতেন বলে অশোক সকল

মানুষের হিত এবং সুখের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। এই নীতির সঙ্গে তাঁর প্রচারিত ধর্মনীতির কোনই বিরোধ ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ করেন নি।

অশোক মানুষ ও পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেখানে যে ওষুধ, মূল ও ফল পাওয়া যেত না, নানা অঞ্চল থেকে তিনি সেগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা কেবল যে তিনি নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যে করেছিলেন, তা নয়। সাম্রাজ্যের বাইরেও পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের অনেকগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। তিনি রাস্তার পার্শ্বে বটবৃক্ষ রোপণ ও আম্রকুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। আট ক্রোশ দূরে দূরে তিনি রাস্তায় কূপ খনন এবং মনুষ্য ও পশুর জলপানের ব্যবস্থা করেন। রাজত্বের প্রথম ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি পঁচিশবার কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। চতুর্থ মুখ্য স্তম্ভশাসনে দেখা যায়, যাতে দণ্ডদান বিষয়ে নিরপেক্ষতার অভাব না ঘটে সেজন্য অশোক জেলার শাসক রজ্জুক সংজ্ঞক কর্মচারীকে অপরাধীর মুক্তি ও শাস্তিদান ব্যাপারে স্বাধীনতা দেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারীর হস্তে বিচারভার থাকায় অপরাধীদের বিচারবিষয়ে তারতম্য ঘটত। পঞ্চদশ মুখ্য গিরিশাসনে দেখা যায়, অশোক বিচারকদের ঈর্ষা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষিপ্রতা, অধ্যবসায়হীনতা, আলস্য এবং ক্লান্তি পরিহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের মৃত্যু তিনদিনের জন্য স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে বন্দীদের আত্মীয়গণ বিচারকদিগের নিকট দয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারত, অথবা বন্দীর নির্দোষতার পক্ষে নূতন প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারত, অথবা মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারত। বন্দীকে মুক্ত করার চেষ্টা বিফল হলেও, আত্মীয়গণ উপবাস ও দানাদি দ্বারা তার পারলৌকিক সদ্‌গতির ব্যবস্থা করতে পারত।

ঐ সকল ব্যবস্থার মূলে ছিল অশোকের আগ্রহ যাতে প্রজাগণের মধ্যে ধর্মাচরণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে লোকের ইহলোক ও

পরলোকে সুখলাভ ঘটে। তিনি তাঁর জনহিতকর ক্রিয়াকলাপকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতেন এবং আশা করতেন যে, সাধারণ লোকেও তাঁর অনুকরণে যথাসম্ভব ধর্মকার্য করবে। তিনি দাবি করেছেন যে, তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে জনগণের মধ্যে ধর্মভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে এবং ফলে লোকের সঙ্গে দেবতাদের মেলামেশা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেছেন, তাঁর ধর্মাচরণের ফলে দেশে ধর্মভাব যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁর পূর্ববর্তী রাজগণ স্বর্গের সুখ এবং নরকের ভয়াবহতা বিষয়ক নানারকমের দৃশ্য দেখিয়েও লোকের মনে তেমন স্বর্গের লোভ এবং নরকের ভয় জাগ্রত করতে পারেন নি।

১০। ধর্মপ্রচার

বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের সর্বাঞ্চলের জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক বহুসংখ্যক ধর্মলিপিতে তাঁর বাণী পর্বতগাত্রে এবং প্রস্তরস্তম্ভে ক্ষোদিত করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্মমহামাত্র সংজ্ঞক কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের এক, তিন বা পাঁচ বৎসরে একবার করে ধর্মপ্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণের আদেশ দেন। অশোকের নির্দেশ ছিল, কর্মচারীরা নিজেদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের কাজ করবে। রাজা নিজেও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তীর্থপর্যটন করতেন। রাজনিযুক্ত ধর্মমহামাত্রগণ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, আজীবিক ও নিগ্রন্থ (জৈন) সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে কাজ করতে ব্যস্ত ছিলেন। রাজা এবং রাজকর্মচারীরা সুযোগ পেলেই ধর্মপ্রচার করতেন। রজ্জুক সংজ্ঞক জেলাশাসক কর্মচারীদের এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

অশোক তাঁর ধর্মের মর্ম বোঝানোর জন্য পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের নানা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ করতেন। এমন কি, সেই সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তিনি হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল স্থাপন করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। পণ্ডিতেরা পশ্চিম-এশিয়ায়—

বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পারসিক সাধু মানীর প্রচারিত ধর্মমতের উপর বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অনুমান করা হয়েছে যে, এটা ঐ অঞ্চলে অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফল। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক শ্রীলঙ্কা এবং সুবর্ণভূমি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পরপারবর্তী দেশসমূহে প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন।

সপ্তম মুখ্য স্তম্ভশাসনে অশোক বলেছেন যে, জনগণের মনে ধর্মের বৃদ্ধি তিনি দুই ভাবে সাধিত করেছেন প্রথমতঃ, জীবহিংসার নিষেধমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের নীতি বিষয়ে জনগণকে বিশেষভাবে বার বার উপদেশ দিয়ে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, উপদেশে যেমন কাজ হয়েছে, বিধিনিষেধে সেরূপ ফললাভ হয় নি। এ থেকে বোঝা যায়, জগতের যে কতিপয় জ্ঞানী রাজনীতিবিদ্ জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রচারকার্যকে আইন-প্রণয়ন অপেক্ষা অধিক কার্যকর মনে করেছেন, অশোক তাঁদের অন্যতম।

অশোকের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রজাগণকে এমন কিছু করতে বলেন নি যা তিনি নিজে করেন নি। তিনি যে চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম মুখ্য গিরিশাসন প্রচারের সময় পর্যন্ত ব্যঞ্জনের জন্য তাঁর রন্ধনশালায় তিনটি প্রাণীর হত্যা বন্ধ করতে পারেন নি, সে কথা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করাতে আমরা অবাক্ হই। অবশ্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কিছুকাল পরে আর ব্যঞ্জনের জন্য কোনও প্রাণী হত্যা করা হবে না।

অশোক যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের মনে আঘাত দিতে চান নি। কিন্তু তিনি জীবের প্রাণ-হানির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ধর্মের জন্যও কোনও প্রাণীর হত্যা সমর্থন করতেন না বলে জানা যায়। তাই যেসকল ধর্মমতে পশুপক্ষী বলির সমর্থন আছে, সেই সব ধর্মাবলম্বীরা অশোক কর্তৃক

পশুপক্ষীর বলি নিষিদ্ধ হওয়ায় অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, মাণ্ডুক্য উপনিষদে যাগযজ্ঞকে মূল্যহীন বলা হয়েছে; সুতরাং যজ্ঞে পশুবলি নিষিদ্ধ করে অশোক হিন্দুগণের বিরাগভাজন হবেন কেন? এটি ভ্রান্ত যুক্তি। পুরাণে কখনও কখনও মূর্তিপূজাকে মূল্যহীন বলা হয়েছে। তাই বলে আইন করে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হলে কোনও যুগেই হিন্দুসমাজ অবিক্ষুব্ধ থাকতে পারত না।

আবার জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র সমাজ বা মেলা অশোক নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাই অনেকে হয়ত মনে করত যে, তিনি জনগণের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। অবশ্য অশোক বলতেন, প্রজারা তাঁর সন্তান এবং আপন সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি যেমন আগ্রহী, প্রজাদের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় উপেক্ষা করা যায় না। অশোকের প্রবর্তিত বিধিনিষেধ পালিত হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা দেখার ভার ছিল তাঁর কর্মচারীদের উপর। রাজার সাধু উদ্দেশ্য তাদের যতই বোঝানো হক, বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের কোথাও কখনও যে কর্মচারীদের ব্যবহারে অবিচার দেখা যেত না, তা বিশ্বাস করা শক্ত।

১১। অশোকের সাফল্য ও ব্যর্থতা

অশোক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি জগতের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। একাধারে তিনি দেশজয়ী বীর, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বোদ্ধা, রাজনীতিবিদ্, রাষ্ট্রশাসক, ধর্ম ও সমাজের সংস্কারক, দার্শনিক এবং সংসারে অনাসক্ত সাধু। তিনি যেভাবে মৌর্যসাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে জনগণের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার ফলেই বৌদ্ধধর্ম পূর্ব-ভারতের একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের পরিবর্তে জগতের অন্যতম সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়েছে। অশোক যে দেশজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছিলেন, সেটা কোনও যুদ্ধে শত্রুহস্তে পরাজিত

হবার পরে নয়, মহাযুদ্ধে পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাষ্ট্র অধিকার করার পরে। পরাক্রমশালী মৌর্যসাম্রাজ্যের বিরাট্ সৈন্য ও ধন-বল সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ-দ্বারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র অধিকারের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তাঁর যে অত্যদ্ভুত কর্মশক্তি, দক্ষতা, সংগঠনশক্তি ও আন্তরিকতা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে অশোকের যেমন ধর্মপ্রাণতা, দানশূরতা ও পক্ষপাতহীনতা প্রকাশ পেত, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজগণের কাছে তা রাজকীয় গুণের আদর্শ হিসাবে গণ্য হত।

অবশ্য যাঁরা বিহারের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র মগধ জনপদকে সৈনাপত্য, রাজনীতিজ্ঞান ও পরাক্রম বলে সমগ্র ভারতবর্ষ অর্থাৎ আধুনিক কালের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ-ব্যাপী এক সুবিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করে তুলেছিলেন, তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত অশোকের ক্রিয়াকলাপকে মূর্খের ভাবপ্রবণতা বলে উপহাস করতেন। অশোক সর্বশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে ধর্মপ্রচারক করে তুলেছিলেন; যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশজয় বর্জন করে সেনাদলকে অকর্মণ্য করে আনছিলেন, দুর্ধর্ষ উপজাতিসমূহকে ধর্মপ্রচারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের অর্থবল দান, স্তূপনির্মাণ ও ধর্মপ্রচারে নিঃশেষ করছিলেন। এই নীতিকে তাঁর পূর্বগামীরা অবশ্যই আদর্শবাদীর স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতেন; একে সার্থক রাজনীতিজ্ঞান বলে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অশোক অবশ্য বলতেন যে, তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীদের দমন করার মত শক্তি তাঁর প্রভূত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার্য, অশোকের উত্তরাধিকারীরা মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে অভ্যুত্থান রোধ করে সাম্রাজ্যের পতনের পথ বন্ধ করতে পারেন নি। যে সেনাদল চন্দ্রগুপ্তের নায়কতায় পশ্চিমএশিয়ার অধিপতি সেলেউকসের বিরাট্ বাহিনীর গতি রোধ করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই মগধ সৈন্যগণ উত্তরকালীন মৌর্য সম্রাট্দের আমলে বাহ্লীক দেশের ক্ষুদ্র যবন-রাজগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নি। এই যবনেরা মৌর্যরাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত অবরোধ করতে সমর্থ হয়।

অবশ্য আমরা বলি না যে, অশোকের শান্তিবাদী নীতি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। কারণ তা হলে বুদ্ধ, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি সকল শান্তিবাদী ধর্ম-প্রচারকের অনুসৃত নীতিকেই নিষ্ফল বলতে হয়। জগতের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য এঁদের চেষ্টার মূল্যবত্তা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমান শতাব্দীর পৃথিবীব্যাপী দুটি মহাযুদ্ধ থেকে আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা দেশজয়ের নীতির অসারতা বুঝেছেন। তাইত প্রথম মহাযুদ্ধের পর League of Nations এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর United Nations Organisation গড়ে ওঠে। অশোকের কৃতিত্ব এই যে, সোয়া দুই হাজার বৎসর পূর্বে তিনি বুঝেছিলেন, যুদ্ধ দ্বারা কোনও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না, কিন্তু প্রেম দ্বারা বিভিন্ন দেশবাসীর হৃদয়জয়ের প্রয়াস সার্থক হতে পারে। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন জগতের যেখানে নানা দেশের নানা জাতির জনগণ ভ্রাতৃভাবে এক পরিবারের লোকের মত বাস করবে। তাঁর স্বপ্ন সফল হবার দিন যে এখনও আসে নি, তা League of Nations-এর পতন এবং United Nations Organisation-এর দুরবস্থা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু সেই অনাগত দিনের অভিমুখে আমরা অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি বলে বোধ হয়। সমস্যা এই যে, এখনও বিভিন্ন দেশবাসীর মনে জাতীয়তা-বোধই প্রবল; তার তুলনায় আন্তর্জাতিকতা-বোধ অত্যন্ত ক্ষীণ।

১২। অশোকের লেখমালা

(ক) ভাষা ও লিপি

অশোকের লেখমালা প্রাকৃত, যাবনিক (গ্রীক) এবং আরামায়িক ভাষায় ও বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত। এগুলিতে আফগানিস্তানে যাবনিক লিপি, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আরামায়িক লিপি, পাকিস্তানে খরোষ্ঠী লিপি এবং ভারতে ও নেপালে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। বর্ণমালাগুলির মধ্যে খরোষ্ঠী হখামনীষীয় রাজগণ দ্বারা উত্তরাপথ অঞ্চলে প্রচারিত আরামায়িক লিপির বিবর্তিত রূপ। ইরানের হখামনীষীয় সম্রাট্ কাইরস (Cyrus, ৫৫৮-৫৩০ খ্রী পূ) সিন্ধুনদের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী

কতকগুলি জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে দারিয়ুস (Darius, ৫২২-৪৮৬ খ্রী-পূ) গন্ধার এবং হিন্দু (সিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু নদের তীরবর্তী দেশ) অধিকার করেন। তখন হতে প্রায় দুইশত বৎসর ঐ অঞ্চল ইরানের অধিকারে ছিল। তখনই আরামায়িক অক্ষরে ভারতীয় ভাষা লিখবার চেষ্টার ফলে খরোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে খরোষ্ঠীর ব্যবহার বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মী ভারতীয় লিপিসমূহের এবং বহির্ভারতীয় বহু বর্ণমালার জননী। বর্তমান ভারতীয় লিপিগুলিতে এদেশের আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ লেখা হয়। আর ভারতের বাহিরের নানা ভাষা লিখতেও ব্রাহ্মীর বিভিন্ন বিবর্তিত রূপের ব্যবহার প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন হরাপ্পা সভ্যতার কতিপয় কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত শীলমোহরগুলিতে ব্যবহৃত লিপির বিবর্তিত রূপ থেকে ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল।

বহুদিন পূর্বে পশ্চিমপঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশিলায় অশোকের একটি খণ্ডিত আরামায়িক লেখ পাওয়া গিয়েছিল। তার অনেক বৎসর পরে আফগানিস্তানের লঘমান অঞ্চলস্থিত পুল-ই-দারুন্তে নামক স্থানে ঐরূপ আর-একটি লেখ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফগানিস্তানের কান্দাহার নগরের নিকটবর্তী শর-ই-কুনা-তে অশোকের একটি অনুশাসনের গ্রীক এবং আরামায়িক ভাষান্তর আবিষ্কৃত হয়। পরে কান্দাহারে অশোকের আরও দুটি মূল্যবান্ লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখে দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসনের শেষার্ধ এবং ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের প্রথম অংশের ভাবানুবাদ আছে। হয়ত ওখানে অশোকের অন্যান্য মুখ্য গিরি-শাসনের গ্রীক অনুবাদও প্রচারিত হয়েছিল। যে প্রস্তরখণ্ডে এই লেখটি পাওয়া গিয়েছে, সেটাকে এক সময় কোনও স্থাপত্য কার্যে লাগানো হয়েছিল বলে মনেহয়। কান্দাহারে প্রাপ্ত অপর একটি লেখে অশোকের সপ্তম মুখ্য স্তম্ভশাসনের কিয়দংশের আরামায়িক ভাষান্তর পাওয়া গিয়েছে।

অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে দু-একটি কথা

বলা প্রয়োজন। স্তম্ভলেখসমূহ এবং ধৌলি, জৌগড়া ও এড়্‌ড়গুডির মুখ্য গিরিশাসনগুলির ভাষাকে মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য 'শ', 'ষ' ও 'স'-এর স্থলে কেবল 'স' অক্ষরটির ব্যবহার এবং সংস্কৃত শব্দের 'র' অক্ষরের পরিবর্তে সর্বত্র 'ল' অক্ষরের প্রয়োগ। সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার বিরল। ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব সর্বত্রই উপেক্ষিত। যেমন সংস্কৃত 'বর্ষ' প্রাকৃতে 'বস্‌স' এবং অনুশাসনের ভাষায় 'বস'। কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত অনুশাসনমালার প্রাকৃতভাষায় কিছু সংস্কৃতের এবং পশ্চিমএশিয়ার ইরানীয় ভাষার প্রভাব দেখতে পাই। কাল্‌সী ও গির্‌নারে অনুশাসনগুলির ভাষা এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী; কিন্তু কাল্‌সীতে মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব বেশী এবং গির্‌নারে বেশী সংস্কৃত ও পাকিস্তানের প্রাকৃতের প্রভাব। সোপারাতে দেখা যায়, সংস্কৃত 'ল' অক্ষরের পরিবর্তে সর্বত্র 'র' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মাগধী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কার্নুল, চিত্রদুর্গ ও বেল্লারিতে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র গিরিশাসনের ভাষার সঙ্গে পশ্চিম-ভারতীয় মুখ্য গিরিশাসনগুলির ভাষার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

(খ) প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

অশোকের অনুশাসনগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পর্বত বা শিলাখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ লেখাবলী, এবং (২) শিলাস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লেখমালা। স্তম্ভগুলি সাধারণতঃ চুনারের বেলেপাথরের একটিমাত্র খণ্ডের দ্বারা নির্মিত। স্তম্ভগাত্র ঘষে ঘষে অদ্ভুত ভাবে মসৃণ করা হয়েছিল। বৃহদাকারের এই গুরুভার স্তম্ভগুলি চুনার থেকে নানা দূরবর্তী স্থানে বয়ে নেওয়া সে আমলের কারু ও যন্ত্র-শিল্পীদের আশ্চর্যজনক নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কাজটি যে কত কঠিন, শমস্‌-ই-সিরাজের 'তারীখ-ই-ফীরূজশাহী'তে দিল্লীর সুলতান ফীরূজশাহ্‌ তুঘলুক (১৩৫১–৮৮ খ্রী) কর্তৃক অম্বালা জেলা ও মেরাঠ থেকে দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে এনে পুনঃস্থাপনের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশে যে সব জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষোদিত আছে, সেগুলি মৌর্য যুগের ভাস্কর্যশিল্পের বিশেষ উন্নত অবস্থার পরিচয় দেয়।

অশোকের অনুশাসনে দেখা যায়, তিনি কখনও কখনও তাঁর শাসন-কর্তাদের পরামর্শ দিতেন, তাঁরা যেখানে যেখানে পর্বত এবং শিলাস্তম্ভ দেখতে পান, তাতে রাজার অনুশাসন ক্ষোদিত করতে যেন অবহেলা না করেন। এতে পূর্ববর্তী রাজগণের দ্বারা উদ্ধৃত জয়স্তম্ভাদির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত যেসকল শিলাস্তম্ভের গাত্রে অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা গিয়েছে, তার সবগুলিই অশোকের নিজের নির্মিত বলে মনে হয়। অবশ্য অমরাবতীতে শিলাস্তম্ভের যে ক্ষুদ্র খণ্ডটি পাওয়া গিয়েছে, তার সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে তাতেও মৌর্যযুগের শিল্পীদের স্তম্ভগাত্রে মসৃণতা সৃষ্টির উৎকর্ষ দেখতে পাই।

অশোকের শিলালেখগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ক্ষুদ্র গিরিশাসন, (২) মুখ্য গিরিশাসন এবং (৩) গুহালেখ। স্তম্ভলেখেরও এইরূপ তিন ভাগ আছে—(১) ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন, (২) স্তম্ভ-লেখ এবং (৩) মুখ্য স্তম্ভশাসন।

(গ) কালক্রম

ষষ্ঠ মুখ্য স্তম্ভশাসনে দেখতে পাই, অশোক অনুশাসন-প্রচার আরম্ভ করেছিলেন তাঁর রাজ্যাভিষেকের (আঃ ২৬৯ খ্রী-পূ) ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে (আনুমানিক ২৫৭ খ্রী-পূ)। তাঁর ক্ষুদ্র গিরিশাসনগুলি (বিশেষতঃ প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনটি) প্রথমে এবং মুখ্য গিরিশাসনসমূহ তার কিছু পরে প্রচারিত হয়।

ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনে রাজা অশোকের নবম রাজ্যবর্ষ (রাজ্যা-ভিষেকের ৮ বৎসর পরবর্তী সময়) এবং অষ্টম মুখ্য গিরিশাসনে একাদশ রাজ্যসংবৎসর (রাজ্যাভিষেকের ১০ বৎসর পরবর্তী কাল) উল্লিখিত দেখা যায়। স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখমালার মধ্যে ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনে কোন তারিখ নেই। স্তম্ভলেখ দুটি রাজত্বের একবিংশ বৎসরে (অভিষেকের ২০ বৎসর পর) উৎকীর্ণ হয়। এর মধ্যে একটিতে অশোকের পঞ্চদশ রাজ্যবর্ষের (রাজ্যাভিষেকের ১৪ বৎসর পরের) ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুখ্য স্তম্ভশাসন অশোকের সপ্তবিংশ রাজ্য

সংবৎসরে (রাজ্যাভিষেকের ২৬ বৎসর পরে) প্রচারিত হয়। সপ্তম মুখ্য স্তম্ভশাসনটি প্রচারিত হয়েছিল তার পরের বছর। ষষ্ঠ স্তম্ভশাসনে রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরের (অভিষেকের ১২ বৎসর পরবর্তী) একটি ঘটনার উল্লেখ পাই।

কেউ কেউ মনে করেন যে, অশোকের লেখমালার তারিখে 'রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর' বলতে 'বর্ত্তমান' বৎসর বুঝতে হবে, 'অতীত' বর্ষ নয়। এ ধারণা সত্য হলে, অভিষেকের আট বৎসর পর হবে অষ্টম বর্ষ, নবম বর্ষ হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে কোন অব্দ বা সালের ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল না। তখন রাজগণের রাজ্য-সংবৎসরই দলিলপত্রের তারিখ হিসাবে ব্যবহৃত হত। শক, পহ্লব ও কুষাণ-বংশীয় বিদেশীয় রাজগণের লেখমালায় সর্বপ্রথম সালের ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের বিক্রম-সংবৎ ও শকাব্দ এইরূপ দুটি বৈদেশিক সাল। বুদ্ধপরিনির্বাণাব্দ কেবল বৌদ্ধবিহারে সীমাবদ্ধ ছিল। কলিযুগসংবৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জ্যোতিষীদের দ্বারা কল্পিত হয়েছিল।

১৩। গিরিলেখ

(ক) ক্ষুদ্র গিরিশাসন

ঐতিহাসিকগণ যাকে অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসন বলেন সেই লেখটি একক ভাবে নিম্নলিখিত দশটি স্থানে পাওয়া গিয়েছে।—

১। আহ্‌রৌরা (মীর্জাপুর জেলা, উত্তর প্রদেশ)।

২। গবীমঠ (কোপ্‌পালের নিকটবর্তী ; রাইচুর জেলা, কর্ণাটক)।

৩। গুজররা (দাতিয়া জেলা, মধ্যপ্রদেশ)।

৪। পানগুড়াড়িয়াঁ (সীহোর জেলা, মধ্যপ্রদেশ)।

৫। পাল্‌কীগুণ্ডু (গবীমঠের নিকটবর্তী ; রাইচুর জেলা, কর্ণাটক)।

৬। বাহাপুর (দিল্লীর নিকটবর্তী)।

৭। বৈরাট (জয়পুর জেলা, রাজস্থান)।

৮। মাস্‌কি (রাইচুর জেলা, কর্ণাটক)।

৯। রূপনাথ (জব্বলপুর জেলা, মধ্যপ্রদেশ)।

১০। সহস্রাম (রোহ্‌তাস জেলা, বিহার)।

প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের পাঠগুলির মধ্যে বৈরাট, রূপনাথ ও সহস্রামের পাঠ বহু পূর্বে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে Alexander Cunningham রূপনাথ অনুশাসনের এবং Carlleyle সাহেব বৈরাট অনুশাসনের ছাপ নেন। তার কাছাকাছি সময়ে Cunningham-এর সহকারী Beglar সাহেব সহস্রাম অনুশাসনের আলোকচিত্র নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই তিনটি অনুশাসনের পাঠ E. Senart এবং G. Buehler প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে Buehler কর্তৃক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—Indian Antiquary-র ষষ্ঠ (১৮৭৭), ৭ম (১৮৭৮) এবং ২২শ (১৮৯৩) খণ্ডে। এ থেকে বোঝা যাবে অনুশাসন তুটির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা কত কঠিন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ অনুশাসনের উপরই একাধিক পণ্ডিত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখানে কেবল প্রথম দিকের পাঠোদ্ধারের উল্লেখ করছি।

এর পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাস্‌কিতে এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গবীমঠ ও পাল্‌কীগুণ্ডুতে প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসন আবিষ্কৃত হয়। মাস্‌কি অনুশাসন এইচ. কৃষ্ণশাস্ত্রী এবং গবীমঠ ও পাল্‌কীগুণ্ডু অনুশাসনদ্বয় R. L. Turner সাহেব প্রকাশ করেন। গত তুই-তিন দশকের মধ্যে পর পর গুজর্‌রা (১৯৫৩), আহ্‌রৌরা (১৯৬১), বাহাপুর (১৯৬৬) ও পানগুড়াড়িয়াঁতে (১৯৭৫) প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসন পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি বর্ত্তমান-গ্রন্থের লেখক কর্তৃক Epigraphia Indica পত্রিকায় বা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। Epigraphia Indica-র ৩১শ, ৫২শ, ৩৬শ ও ৩৮শ খণ্ড এবং ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত Asokan Studies নামক পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

ঐ লেখটি আরও কতকগুলি স্থানে পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু সেসব স্থলে এটির নীচে দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনটি সংযুক্ত দেখা যায়। নিম্নলিখিত

সাত স্থানে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন সংযুক্ত অবস্থায় পেয়েছি।—

১। উড়েগোলম (নিট্টূরের নিকটবর্তী ; বেল্লারি জেলা, কর্ণাটক)।

২। এড়্‌ড়্গুডি (কার্নুল জেলা, আন্ধ্রপ্রদেশ)।

৩। জটিঙ্গ-রামেশ্বর (ব্রহ্মগিরির নিকটবর্তী ; চিত্রদুর্গ জেলা, কর্ণাটক)

৪। নিট্টূর (বেল্লারি জেলা, কর্ণাটক)।

৫। ব্রহ্মগিরি (চিত্রদুর্গ জেলা, কর্ণাটক)।

৬। রাজুলমণ্ডগিরি (কার্নুল জেলা, আন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শিদ্দাপুরা (ব্রহ্মগিরির নিকটবর্তী ; চিত্রদুর্গ জেলা, কর্ণাটক)।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসন প্রথম পাওয়া যায় ব্রহ্মগিরি, জটিঙ্গ-রামেশ্বর এবং শিদ্দাপুরায়। এগুলি B. L. Rice সাহেব আবিষ্কার করেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশ করেন। পরে এই অনুশাসন-সমূহ নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে Buehler রচিত Epigraphia Indica-র ৩য় খণ্ডে (১৮৯৪–১৮৯৫) প্রকাশিত প্রবন্ধটি মূল্যবান্। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এড়্‌ড়্গুডিতে ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী অনু ঘোষ কর্তৃক চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসনের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র গিরিশাসনদ্বয় আবিষ্কৃত হয়। এড়্‌ড়্গুডির ক্ষুদ্র গিরিশাসন দুটি বর্ত্তমান-গ্রন্থের লেখক প্রথমে Indian Historical Quarterly-র সপ্তম খণ্ডে (১৯৩১) প্রকাশ করেন। পরে এ সম্পর্কে বেণীমাধব বড়ুয়া এবং দয়ারাম সাহনীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এড়্‌ড়্গুডির ক্ষুদ্র ও মুখ্য ষোলটি গিরিশাসন সম্পর্কে Epigraphia Indica-র ৩২শ খণ্ডে (১৯৫৭-১৯৫৮) বর্ত্তমান-গ্রন্থের লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে Colin Mackenzie সাহেবের নিযুক্ত পণ্ডিতেরা রাজুলমণ্ডগিরির ক্ষুদ্র গিরিশাসন দুটির সন্ধান পান। বহুকাল পরে এগুলির খোঁজ পড়ে, কিন্তু সন্ধান মেলে না। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরাতত্ত্ববিভাগের লেখবিদ্যা-শাখার কর্মী ভি. বেঙ্কটরামায়্যা এগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন। অনুশাসন দুটি বর্ত্তমান লেখক কর্তৃক Epigraphia Indica-র ৩১শ

খণ্ডে (১৯৫৫-১৯৫৬) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বেল্লারি জেলার নিট্টূর গ্রামে এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উডেগোলম গ্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন পাওয়া গিয়েছে। নিট্টূর ও উডেগোলম শাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা বর্ত্তমান-গ্রন্থ লেখকের Asokan Studies সংজ্ঞক পুস্তকখানিতে (১৯৭৯) প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই দুটি অনুশাসনের বিষয়বস্তু এক হলেও ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গীতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু যেগুলি পরস্পর নিকটবর্তী, তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য খুব কম। এ প্রসঙ্গে চিত্রদুর্গ জেলার তিনটি, বেল্লারি জেলার দুটি, কার্নুল জেলার দুটি এবং রাইচুর জেলার কোপ্পালের সমীপবর্তী দুটি লেখের উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখগুলির অক্ষর অনেক স্থানে অস্পষ্ট কিংবা বিলুপ্ত। কখনও কখনও অন্যান্য সংস্করণের সাহায্যে লুপ্ত অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। অনুশাসনের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কথা বলতে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে চিত্রদুর্গ জেলায় প্রাপ্ত প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের তিনটি পাঠের সূচনার কথা। এখানে বলা হয়েছে যে, সুবর্ণগিরি (বর্ত্তমান এড়্ড়গুডির নিকটবর্তী জোন্ন-গিরি) থেকে আর্যপুত্র (সম্রাটের পুত্র এবং দক্ষিণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা) এবং তাঁর মহামাত্রগণ ইসিল (ঋষিল) নামক স্থানের (বর্ত্তমান ব্রহ্মগিরি-শিদ্দাপুরার) মহামাত্রদের কাছে অনুশাসনটি পাঠিয়েছিলেন। লেখটির পানগুড়াড়িয়া সংস্করণের সূচনাতে দেখা যায়, অশোক যখন তীর্থপর্যটন করছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে মাণেমদেশের একটি বৌদ্ধবিহার অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন কুমার (অর্থাৎ মৌর্য রাজবংশীয়) সংব নামক স্থানীয় শাসকের কাছে অনুশাসনটি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

অশোকের বৈরাটে প্রাপ্ত প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের কাছাকাছি অন্য একটি লেখ পাওয়া গিয়েছে। সেটিকে আমরা তৃতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন বলি। এই অনুশাসনটি বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে লিখিত, অন্য দুটি ক্ষুদ্র গিরিশাসনের ন্যায় মহামাত্রদের উদ্দেশ্যে নয়। এই তৃতীয় ক্ষুদ্র

গিরিশাসনের উদ্দেশ্যও পৃথক্। শর-ই-কুনা-তে আবিষ্কৃত গ্রীক ও আরামায়িক ভাষায় লিখিত লেখটিকে আমরা চতুর্থ ক্ষুদ্র গিরিশাসন বলি। এটি কান্দাহার অঞ্চলের গ্রীক ও কম্বোজ (ইরানীয়) জাতীয় মৌর্য-প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রচারিত। তক্ষশিলা এবং পুল-ই-দারুন্তে-র লেখ দুটিও ক্ষুদ্র গিরিশাসন শ্রেণীর অন্তর্গত। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর চারটি অনুশাসন আফগানিস্তানের লঘমান প্রদেশের অন্তর্গত শালাতাক ও ওয়ার্ঘা গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে একটি আরামায়িক ভাষায় লিখিত। অপরগুলির লিপি এবং ভাষা পৃথক্।

বৈরাটের নিকটবর্তী ভাবরা বা ভাবরূ-তে আবিষ্কৃত তৃতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন প্রথমে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ছিল; এখন ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সেজন্য এটিকে সাধারণতঃ কলকাতা-বৈরাট শাসন বলা হয়। এটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে Burt সাহেব আবিষ্কার করেন এবং তাঁর দ্বারা প্রস্তুত ছাপ থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত কমলাকান্তের সাহায্যে Kittoe সাহেব কর্তৃক ঐ বৎসর সোসাইটির পত্রিকার ৯ম খণ্ডে অনুশাসনটির পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। পরে আরও অনেক পণ্ডিত এই শাসন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তক্ষশিলার খণ্ডিত আরামায়িক শাসনটির প্রতি ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ John Marshall সাহেবের বিভাগীয় কার্যবিবরণীতে পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। Epigraphia Indica-র ১৯শ খণ্ডে (১৯২৭-১৯২৮) E. Herzfeld সাহেব শাসনটির বিষয় আলোচনা করেন। পুল-ই-দারুন্তে-র আরামায়িক অনুশাসন সম্বন্ধে Bulletin of the School of Oriental and African Studies পত্রিকার ১৩শ খণ্ডে (১৯৪৯) W. B. Henning সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কান্দাহারের নিকটে প্রাপ্ত অশোকানুশাসনের গ্রীক ও আরামায়িক সংস্করণ ইতালীয় এবং ফরাসী পণ্ডিতগণ প্রকাশ করেছিলেন। শাসনটির সম্পর্কে Epigraphia Indica পত্রিকার ৩৪শ খণ্ড (১৯৬১-১৯৬২) দ্রষ্টব্য।

(খ) মুখ্য গিরিশাসন

অশোকের চৌদ্দটি মুখ্য গিরিশাসন অনেক জায়গায় একত্র পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনও স্থানে চৌদ্দটির মধ্যে কয়েকটি মাত্র পাওয়া গিয়েছে এবং বাকীগুলি অনাবিষ্কৃত কিংবা বিলুপ্ত। আবার উড়িষ্যার দুটি স্থানে চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসনের অন্তর্গত তিনটি অনুশাসনের পরিবর্তে নূতন দুটি অনুশাসন দেখতে পাওয়া যায়। যে সাত স্থানে অশোকের এই গিরিশাসনগুলি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।—

১। এড়্ড়গুডি (কার্ণুল জেলা, আন্ধ্রপ্রদেশ)। এখানে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত চৌদ্দটি মুখ্য গিরিশাসন প্রস্তরখণ্ডসমূহের গাত্রে ইতস্তত: উৎকীর্ণ আছে।

২। কান্দাহার (আফগানিস্তান)। এখানে গ্রীক ভাষায় লিখিত দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া গিয়েছে। বাকী অনুশাসনগুলির কোন সন্ধান মেলে নি।

৩। কাল্সী (দেরাদুন জেলা, উত্তরপ্রদেশ)। এখানে ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসন পাওয়া গিয়েছে।

৪। গির্নার (জুনাগড়ের নিকটবর্তী পর্বত, গুজরাত)। এখানেও ব্রাহ্মী লিপিতে চতুর্দশ গিরিশাসন উৎকীর্ণ আছে।

৫। মানসেহ্রা (হাজারা জেলা, পাকিস্তান)। এখানে খরোষ্ঠী লিপিতে এবং প্রাকৃত ভাষায় লিখিত চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসন পাওয়া গিয়েছে।

৬। শাহ্বাজগঢ়ী (পেশোয়ার জেলা, পাকিস্তান)। এখানেও খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় চৌদ্দটি মুখ্য গিরিশাসন উৎকীর্ণ আছে।

৭। সোপারা (ঠাণা জেলা, মহারাষ্ট্র)। এখানে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত অষ্টম ও নবম মুখ্য গিরিশাসনের অংশবিশেষমাত্র পাওয়া গিয়েছে।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে James Tod সাহেব গির্নারের লেখাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Lang সাহেব কাপড়ের উপর

অশোকের গির্‌নার গিরিশাসনাবলীর যে চিত্র অঙ্কিত করান, তাই থেকে Prinsep কর্তৃক সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ হয়। তিনি যখন এই চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Kittoe সাহেবের দ্বারা করানো কাপড়ের উপর ধৌলি শাসনাবলীর চিত্রাঙ্কন পরীক্ষার জন্য পান। গিরনার ও ধৌলির অশোকানুশাসন সম্বন্ধে Prinsep-এর প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার সপ্তম খণ্ডে (১৮৩৮) প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে Walter Elliot কর্তৃক জৌগড়ার শাসনাবলী আবিষ্কৃত হল। পরে G. Buehler সাহেব জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় ধৌলি ও জৌগড়ার অশোকানুশাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা নূতন করে প্রকাশ করেন। তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধটি Archaeological Survey of South India-র ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে Forrest সাহেব কাল্‌সীর শাসনাবলী আবিষ্কার করেন এবং ফরাসী পণ্ডিত E. Senart এবং জার্মান পণ্ডিত G. Buehler এগুলির পাঠোদ্ধার করেন। কাল্‌সীর গিরিশাসন সম্পর্কিত Buehler-এর প্রবন্ধ Epigraphia Indica-র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। সোপারাতে কেবল অষ্টম ও নবম গিরিশাসনের অংশমাত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রথম খণ্ডিত লেখটি পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করে Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society পত্রিকার ১৫শ খণ্ডে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়টি ঐ সোসাইটির গ্রন্থাগারিক এন্‌ এ. গোরে মহাশয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন এবং খণ্ডিত শাসনটি বর্তমান-গ্রন্থের লেখক কর্তৃক Epigraphia Indica-র ৩২শ খণ্ডে (১৯৫৭-১৯৫৮) প্রকাশিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের কর্মচারী Court সাহেব শাহ্‌বাজগঢ়ীর খরোষ্ঠী অনুশাসনাবলীর কতকগুলি আবিষ্কার করেন। যাঁরা কাপড়ে এগুলির ছাপ নিতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে C. Masson সাহেবের চেষ্টা প্রশংসনীয়। Norris সাহেব এর মধ্যে কতকগুলি শাসনের পাঠোদ্ধার করেন। এই কাজে আর যাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের মধ্যে E. Senart, পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী

এবং G. Buehler-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রাতে প্রাপ্ত সবগুলি অনুশাসনের পাঠসম্পর্কে Buehler-এর একটি প্রবন্ধ Epigraphia Indica-র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এড়্‌ড়গুডির অনুশাসনাবলী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় এবং এখানকার চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসন বর্তমান-গ্রন্থের লেখক Epigraphia Indica-র ৩২শ খণ্ডে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারে গ্রীক ভাষায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গিরিশাসনের যে অংশবিশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা ফরাসী পণ্ডিতেরা প্রকাশ করেছেন। Epigraphia Indica-র ৩৭শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

এই লেখমালার মধ্যে অনেকগুলির পাঠ নানাস্থানে অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্করণের সাহায্যে পাঠোদ্ধার নিতান্ত অসম্ভব হয় না। দুই-একটি ক্ষেত্রে পর্বতগাত্রে অশোকানুশাসনের কাছাকাছি পরবর্তী যুগের লেখাদিও ক্ষোদিত দেখা গিয়েছে। গির্‌নার পর্বতে অশোকের অনুশাসন ব্যতীত ৭২ শকাব্দে (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার লেখ এবং গুপ্তাব্দের ১৩৮ বর্ষে (৪৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষোদিত গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের লেখ আছে। প্রথম লেখটিতে দেখা যায়, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রিয় পুষ্যগুপ্তের শাসনকালে স্থানীয় পর্বত থেকে নির্গত কয়েকটি স্রোতস্বতীর জলপ্রবাহ বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে সুদর্শন নামক হ্রদের সৃষ্টি করা হয় এবং সম্রাট্ অশোকের আমলে যবনরাজ তুষাস্ফের শাসনকর্তৃত্বকালে চাষীদের ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের সুবিধার জন্য প্রণালী খনন করা হয়। শক রুদ্রদামার সময়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে হ্রদের সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। তখন তাঁর পহ্লব-জাতীয় অমাত্য (শাসনকর্তা) কুলৈপ-পুত্র সুবিশাখের চেষ্টায় বাঁধ পুনর্নির্মিত হলে কৃষকপ্রজাদের হাহাকার শান্ত হয়েছিল। সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ঐ বাঁধ আর একবার ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে যায়। তখন সুরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন পর্ণদত্ত, এবং গিরিনগর (বর্তমান জুনাগড়) শাসন করতেন তাঁর পুত্র চক্রপালিত। এবার চক্রপালিতের চেষ্টায় বাঁধটির পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করে তোসলী (ধৌলি) এবং সমাপা (জৌগড়া) নগরীদ্বয়কে সে দেশের শাসনকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করেন। এই দুটি স্থানে চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসনের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অনুশাসনের পরিবর্তে দুটি নূতন গিরিশাসন পাওয়া যায়। এর কারণ এই যে, রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর (অর্থাৎ নবম রাজ্যবর্ষে) অশোক বাহুবলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। ত্রয়োদশ গিরিশাসনে কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোকের অনুশোচনা এবং যুদ্ধদ্বারা দেশজয়ত্যাগমূলক নীতির উল্লেখ আছে এবং এ বিষয়টি কলিঙ্গবাসীর কাছে তিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কলিঙ্গ দেশের শাসনকেন্দ্রের লেখমালায় অন্যত্র প্রাপ্ত তিনটি গিরিশাসনের পরিবর্তে যে দুটি নূতন গিরিশাসন পাওয়া গিয়েছে, সে দুটি কলিঙ্গবাসীর এবং কলিঙ্গের শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে লিখিত হয়েছিল। ঐ দুটি অনুশাসনকে সাধারণতঃ 'কলিঙ্গের স্বতন্ত্র গিরিশাসন' বলা হয়। আমরা ও দুটিকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ মুখ্য গিরিশাসন বলা ভাল মনে করি। জৌগড়া পাহাড়কে সেকালে বলা হত খেপিঙ্গল পর্বত।

(গ) গুহালেখ

বিহারের গয়া শহর থেকে অল্প দূরে খিজির শরাইয়ের কাছে বরাবর পাহাড়। এর প্রাচীন নাম ছিল স্খলতিক পর্বত। এই পাহাড়ের গায়ে চারটি ক্ষোদিত গুহা আছে। এর মধ্যে তিনটিতে সম্রাট্ অশোকের লেখ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই তিনটির মধ্যে দুটি অশোক আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুগণের বাসের জন্য দান করেছিলেন। আজীবিকেরা ছিলেন ভগবান্ বুদ্ধ এবং জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান্ বর্ধমান মহাবীরের সমসাময়িক মস্করীপুত্র গোশালের অনুগামী।

বরাবর পাহাড়ের নিকটে একই পর্বতের অপর অংশের বর্তমান নাম নাগার্জুনী পাহাড়। সেখানে তিনটি ক্ষোদিত গুহাতে অশোকের পৌত্র রাজা দশরথের লেখ উৎকীর্ণ আছে। পিতামহের মত দশরথও

নিজেকে 'দেবনাম্প্রিয়' বলেছেন। তিনিও গুহাগুলি আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুগণকে দান করেছিলেন। যে তিনটি গুহাতে অশোকের লেখ উৎকীর্ণ দেখা যায়, সেগুলির কাছে আরও একটি ক্ষোদিত গুহা আছে। তাতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মৌখরি বংশের স্থানীয় রাজা অনন্তবর্মার লেখ পাওয়া গিয়েছে।

বরাবর পাহাড়ের গুহালেখগুলি সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন Kittoe সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৬শ খণ্ডে (১৮৪৭)। পরে যাঁরা লেখগুলির পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে Buehler-এর প্রবন্ধ Indian Antiquary-র ২০শ খণ্ডে (১৮৯১) প্রকাশিত হয়।

১৪। স্তম্ভলেখ

(ক) ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন

যে সকল স্তম্ভগাত্রে অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায়, লোকের মনে তার সবগুলির সঙ্গেই মৌর্য সম্রাটের স্মৃতি শত শত বৎসর পূর্বে মুছে গিয়েছে। কোথাও কোথাও স্তম্ভবিশেষকে ফীরূজ-শাহের বা ভীমসেনের লাট বা লাঠ (অর্থাৎ লাঠি বা গদা) বলা হয়। আবার কোথাও বা এগুলিকে লৌড়া (লিঙ্গ অর্থাৎ শিবলিঙ্গ) বলা হয়ে থাকে। অশোকের স্তম্ভলেখের মধ্যে যে ছয়টি বা সাতটি একত্রে পাওয়া যায়, সেগুলি ব্যতীত শিলাস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আরও কতকগুলি অনুশাসনকে ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন বলা হয়। এলাহাবাদ দুর্গের অভ্যন্তরে যে অশোক স্তম্ভটি দেখা যায়, সেটি আসলে ৩৫ মাইল দূরবর্তী কৌশাম্বী বা কোসামে স্থাপিত হয়েছিল। সেখান থেকে কে যে স্তম্ভটিকে এলাহাবাদে এনে পুনঃস্থাপন করেছিলেন, তা জানা যায় না। এই স্তম্ভগাত্রে অশোকের ছটি স্তম্ভশাসন ব্যতীত তাঁর আরও দুটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিতে দুটি অনুশাসন দেখা যায়। এ দুটিকে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন বলতে পারি। এই প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভ-শাসনটি আরও দুটি স্থানে পাওয়া গিয়েছে—মধ্যপ্রদেশের বিদিশার

নিকটবর্তী সাঁচীতে এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে। এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে এর সঙ্গে যে আর-একটি অনুশাসন যুক্ত দেখা যায়, তাকে আমরা দ্বিতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন বলেছি। স্তম্ভটির গাত্রে আরও একটি অশোকানুশাসন আছে। সেটিকে সাধারণতঃ 'রাজমহিষীর অনুশাসন' বলা হয়; কারণ এতে অশোকের দ্বিতীয়া মহিষীর দানের উল্লেখ আছে। আমরা সেটিকে তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন বলেছি। আন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলেখের খণ্ডকে অশোকানুশাসনের অংশ মনে করা হয়েছে। সেটিকে আমরা চতুর্থ ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন বলতে পারি।

এলাহাবাদ-কোসাম স্তম্ভে উৎকীর্ণ তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনের পাঠ ও অনুবাদ Prinsep কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে (১৮৩৭) প্রকাশিত হয়। প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনটি নিয়ে পরে আরও কয়েকজন পণ্ডিত আলোচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে Buehler-এর লিখিত প্রথম ও তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন সম্পর্কিত প্রবন্ধটি Indian Antiquary-র ১৯শ খণ্ডে (১৮৯০) প্রকাশিত হয়।

সারনাথের অশোকস্তম্ভ F. O. Oertel কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র অনুশাসন দুটি J Ph Vogel নামক ওলন্দাজ পণ্ডিত Epigraphia Indica-র ৮ম ভাগে (১৯০৫-১৯০৬) প্রকাশ করেন। এখানে আবিষ্কৃত খণ্ডিত অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন Boyer সাহেব Indian Antiquary-র ১০ম খণ্ডে (১৮৮১) এবং Buehler সাহেব Epigraphia Indica-র ২য় খণ্ডে (১৮৯২-১৮৯৪) প্রকাশ করেছিলেন।

কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী অমরাবতীতে ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনের যে খণ্ডটি পাওয়া গিয়েছে, বর্তমান-গ্রন্থের লেখক সেটির পাঠ Epigraphia Indica-র ৩৫শ খণ্ডে (১৯৬৩-১৯৬৪) প্রকাশ করেছেন।

(খ) স্তম্ভলেখ

উত্তর-প্রদেশের বস্তী জেলার উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলে আবিষ্কৃত দুইটি স্তম্ভে অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায়। এর

প্রথম স্তম্ভটি বস্তী জেলার তুলহা থেকে ৫ মাইল দূরে এবং নেপালের ভগবান্‌পুরা তহশিলের কেন্দ্র থেকে ২ মাইল দূরবর্তী পড়রিয়া গ্রামের রুম্মিনদেঈ (লুম্বিনীদেবী) মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মান। অপর স্তম্ভটি পড়রিয়ার পশ্চিমোত্তরে কয়েক মাইল দূরে নিগলীবা গ্রামে নিগালীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত।

এই দুটি স্তম্ভলেখে সম্রাট্ অশোক কর্তৃক বৌদ্ধতীর্থ পর্যটনের সাক্ষ্য আছে। অভিষেকের ২০ বৎসর পর অশোক ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামে গিয়ে পূজা দিয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে স্তম্ভটি উচ্ছ্রিত হয়েছিল। দ্বিতীয় লেখটি থেকে জানা যায়, অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের ১৪ বৎসর পর পূর্ব-বুদ্ধ কনকমুনির দেহাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপের সংস্কার সাধন করেছিলেন। অভিষেকের ২০ বৎসর পর সেখানে গিয়ে অশোক পূজা দেন এবং স্তম্ভ স্থাপন করেন।

এই স্তম্ভলেখটি Buehler সাহেব কর্তৃক Epigraphia Indica-র ৫ম খণ্ডে (১৮৯৮-১৮৯৯) প্রকাশিত হয়েছিল।

গ. মুখ্য স্তম্ভশাসন

অশোকের চতুর্দশ গিরিশাসন যেমন অনেক স্থানে একত্র পাওয়া যায়, তেমনই স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ তাঁর অনুশাসনসমূহের মধ্যে ছয়টি কতকগুলি স্থানে একত্র পাই। কেবল সপ্তম একটি অনুশাসন এক স্থানে ঐ ছয়টির সঙ্গে সংযুক্ত দেখা যায়।

নিম্নলিখিত ছয়টি স্থানে অশোকের মুখ্য স্তম্ভশাসন পাওয়া গিয়েছে।—

১। তোপরা (আম্বালা জেলা, হরিয়ানা)। এই স্তম্ভগাত্রে সাতটি অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ্ তুঘলুক আম্বালা জেলা থেকে তুলে এনে এটিকে দিল্লীতে স্থাপন করেন। তাই এটি দিল্লী-তোপরা মুখ্য স্তম্ভশাসন বলে খ্যাত।

সপ্তম স্তম্ভশাসনটি অন্য কোনও স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায় না। তবে কান্দাহারে একটি প্রস্তরখণ্ডে অনুশাসনটির কিয়দংশের

ভাবানুবাদ আরামায়িক ভাষায় ক্ষোদিত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেটিকে ক্ষুদ্র গিরিশাসনের অন্তর্গত ধরাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য কান্দাহারে অন্যান্য স্তম্ভশাসনগুলিও প্রস্তরখণ্ডে ক্ষোদিত হয়েছিল কিনা, তা বলা সম্ভব নয়।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির Asiatic Researches পত্রিকার ১ম খণ্ডে দিল্লী-তোপরা স্তম্ভটির প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই সেখানে অনুশাসনগুলির ছাপ সংরক্ষিত ছিল। অশোকানুশাসনের মধ্যে এই স্তম্ভশাসনসমূহের পাঠোদ্ধারই Prinsep সাহেব সর্বপ্রথম করেছিলেন। Prinsep-এর পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে (১৮৩৭) প্রকাশিত হয়। ঐ সঙ্গে Prinsep দিল্লী-মেরাঠের স্তম্ভে উৎকীর্ণ ছটি অনুশাসনের ছাপ প্রকাশ করেছিলেন। G. Buehler এগুলির পাঠোদ্ধার করে Indian Antiquary-র ১৯শ খণ্ডে (১৮৯০) প্রকাশ করেন। Epigraphia Indica পত্রিকার ২য় খণ্ডেও (১৮৯২-১৮৯৪) এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। Buehler সাহেব ঐ সঙ্গেই লৌড়িয়া অররাজ, লৌড়িয়া নন্দনগড় এবং রামপুর্‌বার মুখ্য স্তম্ভশাসনগুলিও প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই কিছুকাল পূর্বে এলাহাবাদ-কোসামের স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ ছটি মুখ্য অনুশাসনের পাঠ Indian Antiquary পত্রিকার ১৩শ খণ্ডে (১৮৮৪) প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে Epigraphia Indica-র ২য় খণ্ডেও এই পাঠ পুনঃ প্রকাশিত হয়েছিল।

২। এলাহাবাদ (উত্তরপ্রদেশ)। স্তম্ভটি পূর্বে ৩৫ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত কৌশাম্বী বা কোসামে স্থাপিত ছিল। তাই এটিকে এলাহাবাদ-কোসাম স্তম্ভ বলা হয়। স্তম্ভগাত্রে ছয়টি অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায়। তা ছাড়া এই স্তম্ভে অশোকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনও ক্ষোদিত আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত (আ ৩৩৫-৭৬ খ্রী) হরিষেণরচিত তাঁর অনুপম প্রশস্তিটি এই স্তম্ভেরই গাত্রে উৎকীর্ণ করেছিলেন। প্রয়াগের তীর্থ-

যাত্রীরা অনেকে তাঁদের নাম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখ খোদাই করে প্রাচীন লেখগুলির পাঠ অনেক স্থানে বিকৃত ও বিনষ্ট করেছেন। এই স্তম্ভেই মুঘল সম্রাট্ জাহান্গীরের (১৬০৫-২৭ খ্রী) পারসী ভাষায় লিখিত হিজরী ১০১৪ সালের (১৬০৫খ্রী) একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে।

৩। মেরাঠ (উত্তরপ্রদেশ)। আম্বালার অশোকস্তম্ভের ন্যায় মেরাঠের স্তম্ভটিও সুলতান ফীরূজশাহ্ দিল্লীতে এনে পুনঃস্থাপিত করেন। তাই এটিকে দিল্লী-মেরাঠ স্তম্ভ বলা হয়। এই স্তম্ভে ছয়টি অনুশাসন ক্ষোদিত দেখা যায়।

৪। লৌড়িয়া অররাজ (রাধিয়ার নিকটবর্তী, চম্পারণ জেলা, বিহার)। এই স্তম্ভে ছয়টি অনুশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল। 'লৌড়িয়া' শব্দের অর্থ 'যেখানে লিঙ্গ (অর্থাৎ শিবলিঙ্গ) আছে'।

৫। লৌড়িয়া নন্দনগড় (মাথিয়ার নিকটবর্তী, চম্পারণ জেলা, বিহার)। এ স্তম্ভটিতেও ছয়টি অনুশাসন ক্ষোদিত আছে।

৬। রামপুর্বা (চম্পারণ জেলা, বিহার)। এখানেও উৎকীর্ণ অনুশাসনের সংখ্যা ছয়টি।

১৫। নকল লেখাবলী

কেহ কেহ পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন যাদুঘর প্রভৃতির কাছে বিক্রয়ের জন্য। এই জাতীয় বস্তুর মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা জাল করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। অন্যান্য ধরনের বস্তুও কিছু কিছু নকল করা হয়েছে। অশোকের লেখমালার মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভলেখ, বিশেষ করে রুম্মিনদেঈ স্তম্ভলেখটি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীর নমুনা হিসাবে দু-একখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে ঐ লেখটির একটি চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই জালিয়াতেরা তৎপর হয়। অর্ধশতাব্দী পূর্বে উড়িষ্যার পুরী জেলায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী কপিলেশ্বর বা কপিলপ্রসাদ গ্রামে প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ রুম্মিনদেঈ স্তম্ভলেখের একটি নকল আবিষ্কৃত হল। এই জাল লেখটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

মথুরার সরকারী যাদুঘরে ঐ একই লেখের আর-একটি নকল আছে। এটি মৃত্তিকানির্মিত পট্টের উপর উৎকীর্ণ।

আশ্চর্যের বিষয়, ভুবনেশ্বরের নিকটে প্রাপ্ত জাল লেখটির ভিত্তিতে কোন কোন উড়িয়া লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভগবান্ বুদ্ধ উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, ঐ অসম্ভব সিদ্ধান্তটি নিয়ে লেখা একখানি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন জনৈক খ্যাতনামা বিদেশীয় অধ্যাপক।

অশোকের খরোষ্ঠী লেখমালা অমসৃণ পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ। তাই তার কোনটিরই খোদাইকার্য রুম্মিনদেঈর স্তম্ভলেখের মতন সুস্পষ্ট নয়। সেজন্য কিছুকাল পূর্বে (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য মৌর্যযুগের খরোষ্ঠীর নমুনা হিসাবে আমরা শাহ্‌বাজগঢ়ীর সপ্তম মুখ্য গিরিশাসনের একটি প্রতিলিপি স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত করে প্রকাশ করেছিলাম। তাতে জালিয়াতদের বেশ সুবিধা হল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা শাহ্‌বাজগঢ়ীর সপ্তম মুখ্য গিরিশাসনের অধিকাংশের নকল একটি পাথরের বাটির গায়ে উৎকীর্ণ করতে পারল এবং শীঘ্রই বাটিটি বোম্বাইয়ের Prince of Wales Museum-এ রক্ষার ব্যবস্থা হল। জনৈক বিদেশীয় পণ্ডিত এই জালিয়াতি ধরতে পারেন নি।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলার অন্তর্গত দেওটেক নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখকে কেউ কেউ অশোকের অনুশাসন মনে করেছেন। কিন্তু এই লেখটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা যায় না।

অনুশাসনমালা

প্রথমাংশ

ক. ক্ষুদ্র গিরিশাসন

১। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসন

[রূপনাথের পাঠ।]

[অনুশাসনটি অশোকের কর্মচারীদের উদ্দেশে প্রচারিত হয়েছিল। রূপনাথের পাঠে অনুশাসনের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকার দেখা যায়। এটির অন্যান্য পাঠ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিয়েছে—আহ্‌রৌরা, উডেগোলম, এড়্‌ড়গুডি, গবীমঠ, জটিঙ্গ-রামেশ্বর, নিট্টূর, মাস্‌কি, পানগুড়াড়িয়াঁ, পাল্‌কীগুণ্ডু, বাহাপুর (দিল্লী), বৈরাট, ব্রহ্মগিরি, রাজুলমণ্ডগিরি, শিদ্দাপুরা এবং সহস্রাম।]

দেবপ্রিয় এইরূপ কথা বলেছেন।—

কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর পূর্বে আমি প্রকাশ্যে শাক্য (বৌদ্ধ উপাসক) হই। কিন্তু এক বৎসর পর্যন্ত আমি ধর্মের জন্য বেশী রকম উৎসাহী হই নি। গত এক বৎসরের অধিককাল আমি বৌদ্ধ সংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি এবং ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়েছি।

এ পর্যন্ত জম্বুদ্বীপে দেবগণ মনুষ্যের সঙ্গে অমিলিত ছিলেন; আমি তাঁদের মনুষ্যের সঙ্গে মিলিত করেছি। এটা আমার উদ্যমের ফল। এই ফল যে কেবল আমার মত বড় লোকেরাই পেতে পারে, তাই নয়। ধর্মবিষয়ে উদ্যমশীল দরিদ্রও মহাস্বর্গ পর্যন্ত লাভ করতে সমর্থ হয়।

আমি এই উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাটি প্রচার করছি যেন নির্ধন ও ধনী সকলেই ধর্মব্যাপারে উদ্যমশীল হয় এবং আমার সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত প্রতিবেশী জনপদের অধিবাসীরাও যেন বিষয়টি জানতে পারে। আর জনগণের এই উদ্যমশীলতা যেন দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে। এর ফলে এই বিষয়টি বৃদ্ধি পাবে, বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, কমবেশী অন্ততঃ দেড়গুণ বৃদ্ধি পাবে।

তোমরা (মহামাত্রগণ) সুযোগ পেলে পর্বতগাত্রে বিষয়টি লিখিয়ো। যদি কোথাও শিলাস্তম্ভ দেখতে পাও, তবে সে সব স্তম্ভগাত্রেও এটা লেখানো উচিত হবে। আমার এই ঘোষণার ব্যঞ্জনা অনুসারে তোমাদের অধীন জেলার সর্বত্র তোমরা পর্যটন করবে।

তীর্থে-তীর্থে পর্যটনরত অবস্থায় আমার দ্বারা এই ঘোষণাটি প্রচারিত হল। আজ পর্যন্ত ২৫৬ রাত্রি আমার প্রবাসে কেটেছে।

[মাস্‌কির পাঠ।]

[এখানে প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ পাওয়া যায়।]

দেবপ্রিয় অশোকের ঘোষণা।—

আড়াই বৎসরের কিছু অধিককাল পূর্বে আমি বুদ্ধ-শাক্য (বুদ্ধের উপাসক) হই। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর আমি বৌদ্ধ সংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছি এবং ধর্মের জন্য উদ্যম লাভ করেছি। পূর্বে জম্বুদ্বীপে দেবতারা মনুষ্যগণের সঙ্গে মিলিত ছিলেন না; এখন তাঁরা মিলিত হয়েছেন।

ধর্মের জন্য উদ্যমশীল দরিদ্রও এই ফল লাভ করতে পারে। কেবল ধনীদেরই যে ফললাভ হবে, তা নয়। ধনী-দরিদ্র উভয়কেই বলতে হবে, "তোমরা যদি এইভাবে কাজ কর, তবে এই ফল দীর্ঘ-স্থায়ী হবে এবং দেড়গুণ বৃদ্ধি পাবে।"

[গুজর্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকরাজের ঘোষণা।—

আমি এই আড়াই বৎসর বৌদ্ধ উপাসক হয়েছি।

তিনি বলেছেন, "কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বৌদ্ধসংঘ আমার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছে এবং আমি ধর্মের জন্য উদ্যমশীল হয়েছি।"

জম্বুদ্বীপে দেবপ্রিয়ের প্রজাগণ পূর্বে দেবগণের সঙ্গে অমিলিত ছিল; এই সময়ে তাদের তিনি দেবগণের সঙ্গে মিলিত করলেন। এ তাঁর ধর্মবিষয়ক উদ্যমের ফল। এই ফললাভ যে কেবল ধনীদের

পক্ষে সম্ভব, তা নয়; দরিদ্র ব্যক্তিও যদি ধর্মের জন্য উদ্যমশীল হয়, ধর্মাচরণ করে এবং জীবহিংসাবিষয়ে সংযম অবলম্বন করে, তবে সেও মহাস্বর্গ লাভ করতে পারে।

ঘোষণাটি প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ। দরিদ্র ও ধনীরা ধর্মাচরণ করুক এবং ফলে দেবগণের সঙ্গে মিলিত হোক। প্রত্যন্ত জনপদের অধিবাসীরাও জানুক যে, ধর্মাচরণের আরও বৃদ্ধি ঘটবে। জনগণ বিশেষভাবে এই ধর্মের আচরণ করলে ফললাভও বৃদ্ধি পাবে।

এই ঘোষণা রাজার তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে পর্যটনকালে ২৫৬ রাত্রি অতিবাহিত হবার পর প্রচারিত হয়।

[পানগুড়াড়িয়াঁর পাঠ—প্রথমাংশ।]

প্রিয়দর্শী নামক রাজা মাণেমদেশে উপুনিথবিহারে যাত্রার পথ থেকে কুমার সংবের উদ্দেশ্যে লিখছেন।—

রাজার তীর্থপর্যটন উপলক্ষ্যে বাহিরে অবস্থানকালে ২৫৬ রাত্রি অতিবাহনের পর এই ঘোষণা প্রচারিত হল। দেবপ্রিয় এইরূপ আদেশ দিচ্ছেন।—

আমি এই আড়াই বৎসর উপাসক হয়েছি। ইত্যাদি।

[ব্রহ্মগিরির পাঠ—প্রথমাংশ।]

সুবর্ণগিরি থেকে প্রদেশ-শাসক আর্যপুত্রের এবং তাঁর মহামাত্রগণের বচনে ঋষিল (ইসিল) নগরের মহামাত্রগণকে তাঁদের আরোগ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে। পরে তাঁদিগকে এই কথা বলতে হবে। দেবপ্রিয় আজ্ঞা দিচ্ছেন।—

আড়াই বৎসরেরও অধিক কাল আমি উপাসকত্ব অবলম্বন করেছি। কিন্তু এক বৎসর পর্যন্ত বিশেষভাবে উদ্যম প্রকাশ করি নি। ইত্যাদি।

[আহ্‌রৌরার পাঠ—শেষাংশ।]

ধর্মবিষয়ক উদ্যমশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হোক। বিষয়টি বৃদ্ধি পাবে, খুব বেশীরকম বৃদ্ধি পাবে, দেড়গুণ বৃদ্ধি পাবে।

বুদ্ধের দেহাবশেষ মঞ্চের উপর সংস্থাপিত হবার পর পর্যটনরত অবস্থায় রাজার ২৫৬ রাত্রি অতিবাহিত হলে এই ঘোষণাটি প্রচারিত হল।

[**নিট্টুরের পাঠ**—শেষাংশ।]

এই ঘোষণাটি রাজার পর্যটনরত অবস্থায় ২৫৬ রাত্রি গত হবার পর প্রচারিত হল। এটি সমস্ত পৃথিবীতে (সাম্রাজ্যের সর্বত্র) প্রেরিত হয়েছে—যেমন রাজা অশোক বলেছেন, ঠিক সেই আদেশ অনুসারে।

২। দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন

[**ব্রহ্মগিরির পাঠ**।]

[এখানে প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের সঙ্গে দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন সংযুক্ত আছে। ব্রহ্মগিরি, শিদ্দাপুরা এবং জটিঙ্গ-রামেশ্বর তিনটি পাশাপাশি গ্রাম। এই তিন স্থানে অনুশাসনদ্বয়ের পাঠে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসনের পাঠ এই তিন স্থান ব্যতীত মৌর্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে পাওয়া গিয়েছে—কার্ণুল জেলার এড়্‌ড়গুড়ি ও রাজুলমণ্ডগিরি এবং বেল্লারি জেলার উডেগোলম ও নিট্টুর।]

এ সম্বন্ধে দেবপ্রিয় এই রকম কথা বলেছেন।—

মাতা, পিতা এবং গুরুজনের বাধ্য হতে হবে। জীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। সত্য কথা বলতে হবে। এইভাবে ধর্মসম্পর্কিত গুণসমূহের প্রবর্তন করতে হবে।

এইরূপে শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যথাযথভাবে এই ব্যবহার প্রচলিত করতে হবে। এটি পুরাতন নিয়ম এবং ব্যবস্থাটি বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। এই অনুসারে কাজ করতে হবে।

অনুশাসনটি চপল নামক লিপিকর দ্বারা লিখিত হয়েছে।

[এড়্‌ড়গুডির পাঠ।]

[এখানে অনুশাসনটি আকারে একটু বড়। এড়্‌ড়গুডি ও রাজুল-মণ্ডগিরির পাঠে সাদৃশ্য আছে।]

দেবপ্রিয় এইরকম কথা বলেছেন।—

দেবপ্রিয় যে ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, সেইভাবে তোমরা (মহামাত্রগণ) কাজ করবে। তোমরা রজ্জুকদের আজ্ঞা দেবে; রজ্জুকেরা আবার জনপদের অধিবাসীদের এবং রাষ্ট্রিক সংজ্ঞক কর্মচারীদের এই ভাবে আজ্ঞা দেবে—"মাতাপিতার বাধ্য হতে হবে। গুরুজনদেরও বাধ্য হতে হবে। জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। সত্য কথা বলতে হবে। ধর্মসম্পর্কিত এই গুণগুলি প্রচার করতে হবে।" দেবপ্রিয়ের কথায় এইভাবে তোমরা আজ্ঞা দেবে।

অনুরূপভাবে হস্তিচালক, পাটোয়ারী, রথচালক এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় শিক্ষকগণকে তোমরা এই মর্মে আদেশ করবে—"পুরাতন প্রথা অনুসারে তোমরা তোমাদের শিষ্যদের উপদেশ দেবে। এই শিক্ষা মেনে চলতে হবে। গুরুর যে সম্মান প্রাপ্য তা এইভাবে প্রবর্তন করতে হবে। গুরুর জ্ঞাতিগণ তাঁদের রমণীদের মধ্যে এই শিক্ষা প্রবর্তিত করবেন। পুরাতন প্রথা অনুসারে শিষ্যদের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে হবে। এভাবে তোমরা শিষ্যগণকে যথাযথরূপে চালিত ও শিক্ষিত করবে যেন তাদের মধ্যে আদর্শটি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।"

এটা দেবপ্রিয়ের আজ্ঞা।

[উডেগোলমের পাঠ—প্রথমাংশ।]

দেবপ্রিয় রাজা অশোক এই কথা বলেছেন।—

তোমরা (মহামাত্রগণ) রজ্জুককে আদেশ দেবে। সে আবার জনপদবাসীদের এবং রাষ্ট্রিক সংজ্ঞক কর্মচারীকে আদেশ করবে। ইত্যাদি।

৩। তৃতীয় ক্ষুদ্র গিরিশাসন

[যে শিলাখণ্ডে এই অনুশাসনটি উৎকীর্ণ সেটি বৈরাটে ভাবরূ নামক স্থানের নিকট পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে সেটি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই অনুশাসনের পাঠ আর কোথাও পাওয়া যায় নি।]

মগধদেশীয় রাজা প্রিয়দর্শী বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে অভিবাদন করছেন এবং ভিক্ষুগণের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় জানতে চেয়ে বলছেন।—

মাননীয় মহোদয়গণ, আপনারা ত জানেন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ কত গভীর।

মহোদয়গণ, ভগবান্ বুদ্ধ যাই কিছু বলেছেন, সে সমস্তই উত্তমরূপে বলা হয়েছে। কিন্তু মহোদয়গণ, সদ্ধর্ম যাতে চিরস্থায়ী হয় সেবিষয়ে আমার যা চোখে পড়ছে সেকথা আপনাদিগকে আমার বলা উচিত।

মহোদয়গণ, আমাদের এই ধর্মগ্রন্থগুলি[১] রয়েছে—

১। বিনয়সমুৎকর্ষঃ (নিয়ম মেনে চলার প্রশংসা)।

২। আর্যবাসাঃ (জীবনযাত্রার বিভিন্ন অবস্থা)।

৩। অনাগতভয়ানি (ভবিষ্যৎ ভয়)।

৪। মুনিগাথা (সংসারত্যাগীর গাথা)।

৫। মৌনেয়সূত্রম্ (সংসারত্যাগী সম্পর্কে আলোচনা)।

৬। উপতিষ্যপ্রশ্নঃ (উপতিষ্যের জিজ্ঞাসা) এবং

৭। রাহুলাববাদঃ (রাহুলকে প্রদত্ত উপদেশ)। ভগবান্ বুদ্ধ মিথ্যাচার বিষয়ে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

মহোদয়গণ, আমার ইচ্ছা এই যে, যত বেশী ভিক্ষুপাদ এবং ভিক্ষুনীগণের পক্ষে সম্ভব, তাঁরা এগুলির পাঠ সর্বদা শুনুন এবং তৎসম্পর্কে চিন্তা করুন। উপাসক ও উপাসিকারাও তাই করুন।

---

১ এখানে যে সাতটি বৌদ্ধগ্রন্থের নামোল্লেখ দেখা যায়, পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে তাদের স্থান নিরূপণ করা কঠিন। পণ্ডিতেরা গ্রন্থগুলির বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। অশোকের সময়ের বৌদ্ধসাহিত্য অবিকৃতভাবে পরবর্তী কালীন ত্রিপিটকে গৃহীত হয় নি।

মহোদয়গণ, এইজন্য আমি এই লিপি লেখাচ্ছি যেন সকলে আমার অভিপ্রায় জানতে পারেন।

৪। চতুর্থ ক্ষুদ্র গিরিশাসন

[এই অনুশাসনটির গ্রীক ও আরামায়িক পাঠ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আফগানিস্তানের কান্দাহার নগরের নিকটবর্তী শর-ই-কুনা-তে আবিষ্কৃত হয়।]

[গ্রীক পাঠ।]

রাজ্যাভিষেকের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে রাজা প্রিয়দর্শী জনগণকে ধর্ম কিরকম তা দেখালেন। তখন থেকে তিনি জনসাধারণকে অধিক ধর্মপরায়ণ করে তুললেন এবং তাতে সমস্ত পৃথিবীতে মানুষের উন্নতি হতে লাগল।

রাজা জীবহত্যা করেন না। রাজার অধীন ব্যাধ ও ধীবর প্রভৃতি সকল লোকেই মৃগয়া ত্যাগ করেছে। যারা পূর্বে নিজেদের সংযত করতে পারত না, তারা এখন যথাসম্ভব অসংযম পরিত্যাগ করেছে।

আগে যা অবস্থা ছিল, তার পরিবর্তে লোকে এখন পিতামাতা এবং বৃদ্ধগণের বাধ্য হয়েছে। এখন থেকে তাদের জীবনযাত্রা পূর্বাপেক্ষা উন্নত এবং লাভজনক হবে।

[আরামায়িক পাঠ।]

দশ বৎসর অতীত হল, আমাদের প্রভু রাজা প্রিয়দর্শী সত্যের (সত্য-ধর্মের) প্রবর্তন করেছেন। তখন থেকে জনসাধারণের মধ্যে পাপকাজ কমে গেল এবং ফলে এখন সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ দেখা যাচ্ছে।

অধিকন্তু খাদ্য সম্বন্ধে লক্ষণীয় এই যে, আমাদের প্রভু রাজামহাশয়ের জন্য কয়েকটি মাত্র প্রাণী হত্যা করা হচ্ছে। তা দেখে জনসাধারণ জীবহত্যা ত্যাগ করেছে। এমনকি ধীবরেরাও বর্তমানে জীবহত্যানিষেধ বিষয়ক নিয়মের অধীন।

এইরূপে যারা পূর্বে সংযত ছিল না, তারা সংযম পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। ভাগ্যবশে মানুষ যে যেমন অবস্থায় আছে, তদনুযায়ী তাদের

মাতাপিতা এবং বৃদ্ধজনের প্রতি বাধ্যতা দেখা যাচ্ছে। ধার্মিক মনুষ্যদের জন্য শেষবিচার ও শাস্তি নেই।

এই ধর্মাচরণ সকলের পক্ষেই লাভজনক হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও লাভজনক হবে।

খ. মুখ্য গিরিশাসন

৫। প্রথম মুখ্য গিরিশাসন

[গির্নারের পাঠ।]

[প্রথম থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত মুখ্য গিরিশাসনগুলি গির্নার ব্যতীত এড়্ড়গুডি, কাল্সী, মানসেহ্রা এবং শাহ্বাজগঢ়ীতে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে শেষের দুটি স্থানে খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত, অন্যত্র ব্রাহ্মী। সোপারাতে কেবলমাত্র অষ্টম ও নবম মুখ্য গিরিশাসনের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। কান্দাহারে গ্রীকভাষায় দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসনের শেষার্ধ এবং ত্রয়োদশের প্রথমার্ধ দেখা যায়। প্রথম থেকে দশম এবং চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসন ধৌলি ও জৌগড়াতে পাওয়া গিয়েছে। এ দুটি স্থানে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের পরিবর্তে দুটি নূতন অনুশাসন দেখা যায়। আমরা সে দুটিকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ মুখ্য গিরিশাসন বলেছি।]

এই ধর্মলিপিটি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার দ্বারা লেখানো হয়েছে।

এখানে কোন প্রাণীকে হত্যা করে যজ্ঞ করা চলবে না। কোনও মেলারও অনুষ্ঠান করা যাবে না। কারণ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা মেলাতে বহু রকমের দোষ দেখতে পান। অবশ্য এক রকমের মেলা (ধর্মবিষয়ক মেলা) আছে, সেটা দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা উত্তম জ্ঞান করেন।

পূর্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর রন্ধনশালায় প্রতিদিন ব্যঞ্জনের জন্য বহু শতসহস্র প্রাণী হত্যা করা হত। কিন্তু এখন বর্তমান ধর্মলিপিটির প্রচারের সময় ব্যঞ্জনের জন্য দৈনিক মাত্র তিনটি প্রাণী হত্যা করা হচ্ছে—দুটি পক্ষী এবং একটি পশু।[১] এই পশুটিও নিয়মিতভাবে রোজ হত্যা করা হয় না। উল্লিখিত তিনটি প্রাণীও পরে আর হত্যা করা হবে না।

---

১ অনেকে এ স্থলে 'দুটি ময়ূর এবং একটি মৃগ' বুঝেছেন

৬। দ্বিতীয় মুখ্য গিরিশাসন

[গিরনারের পাঠ।]

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর রাজ্যের সর্বত্র এবং বাহিরের প্রত্যন্ত জনপদ-সমূহে—যেমন দক্ষিণে তাম্রপর্ণী পর্যন্ত চোল ও পাণ্ড্যজাতির দেশ এবং সাতিয়পুত্র ও কেরলপুত্রের রাজ্য (সাতিয় ও কেরল দেশ) এবং পশ্চিমদিকের যবনরাজ অন্তিয়োকের ও সেই অন্তিয়োকের নিকটবর্তী রাজগণের দেশ—সর্বত্র দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী দুরকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন—মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা। মনুষ্যের উপযোগী ও পশুর উপযোগী ওষুধপত্র যেখানে যেটা নেই, সর্বত্র সেগুলি সংগৃহীত এবং রোপিত হয়েছে। মূল ও ফল যেখানে যেটা নেই, সর্বত্র সেগুলি সংগৃহীত ও রোপিত হয়েছে। মনুষ্য এবং পশুর ভোগের জন্য কূপ খনন করা হয়েছে এবং বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

৭। তৃতীয় মুখ্য গিরিশাসন

[গিরনারের পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই রকম বলেছেন।—

রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে আমি এই আদেশ দিয়েছি।—

আমার রাজ্যের সর্বত্র নিযুক্ত[১] রজ্জুক এবং প্রাদেশিকগণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার গ্রামাঞ্চলে পর্যটন করতে যাবে। তারা তখন যেমন অন্যান্য নিয়মিত কাজ করবে, তেমনই নিম্নলিখিত ভাবে আমার উদ্দিষ্ট ধর্মপ্রচার কার্যও করবে।—

“মাতা ও পিতার প্রতি বাধ্যতা সমুচিত কার্য। মিত্র, পরিচিত ও আত্মীয়স্বজনকে এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে অর্থাদি দান সমুচিত কার্য। প্রাণী হত্যা না করা, অল্প ব্যয় করা এবং অল্প সঞ্চয় করা সমুচিত কার্য।”

মন্ত্রি-পরিষদ্ রাজকার্যে নিযুক্ত[১] কর্মচারীদিগকে আমার এই অনুশাসনটি উদ্দেশ্য (বা কারণ) অনুসারে এবং ব্যঞ্জনা অনুসারে অনুসরণ করতে আদেশ দেবে।

---

১ এ স্থলে মূলে যে ‘যুক্ত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অনেকে সেটিকে রজ্জুক ও প্রাদেশিকের ন্যায় কর্মচারী বিশেষের সংজ্ঞা বলে মনে করেন।

৮। চতুর্থ মুখ্য গিরিশাসন

[গির্‌নারের পাঠ।]

এ পর্যন্ত যে বহু শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়েছে, সে সময়ে প্রাণীদের হত্যা, জীবহিংসা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি দুর্ব্যবহার বেড়ে গেছে। কিন্তু আজ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মাচরণের ফলে ভেরী দ্বারা ঘোষণার অর্থই ধর্মঘোষণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরলোকে গিয়ে লোকে স্বর্গে বা নরকে কি অবস্থা ভোগ করবে, সেটা বোঝাবার জন্য স্বর্গীয় যান (বা আবাস) ও হস্তী প্রদর্শন করিয়ে এবং অগ্নিস্তূপ ও অন্য নানাবিধ দিব্যরূপ দেখিয়ে বহু শতাব্দীতেও পূর্বে যা হয় নি, এখন তাই ঘটেছে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম প্রচারের ফলে আজ এইগুলি বেড়েছে—প্রাণীদের হত্যা ও জীবহিংসা না করা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি সদ্ব্যবহার, মাতা ও পিতার প্রতি বাধ্যতা এবং বৃদ্ধজনের প্রতি বাধ্যতা। এইগুলি এবং এইরূপ বহুবিধ ধর্মাচরণ আজ বেড়েছে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্মাচরণ আরও বাড়াবেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণও প্রলয়কাল পর্যন্ত এটা বাড়াবেন ; কারণ তাঁরা ধর্ম ও শীলে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্মপ্রচার করবেন।

এই যে ধর্মপ্রচার, এটাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। যে শীলহীন তার ধর্মাচরণ হয় না। এই বিষয়ের বৃদ্ধি ও ঘাটতির অভাব বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান ধর্মলিপি এই উদ্দেশ্যে লেখানো হয়েছে যেন লোকের ধর্মাচরণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ঘাটতি যেন কেউ সহ্য না করে।

রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্মলিপি লিখিয়েছেন।

৯। পঞ্চম মুখ্য গিরিশাসন

[মানসেহ্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরকম বলেছেন।—

লোকের কল্যাণ করা কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি প্রথম লোকের কল্যাণ করে, সে দুষ্কর কার্য করে। কিন্তু লোকের কল্যাণ আমি বহু

করেছি। তাই আমার পুত্র ও পৌত্রগণ এবং আমার বংশধরেরা প্রলয়কাল পর্যন্ত যে কেউ আমার এই কাজের অনুবর্তী হবে, সে পুণ্যকার্য করবে। তাদের মধ্যে কেউ যদি এ ব্যাপারটি লেশমাত্রও ত্যাগ করে, তবে সে পাপকার্য করবে। পাপ করা বড়ই সহজ।

বহুকাল অতীত হয়েছে, এ সময়ে ধর্মমহামাত্র নামক কোন কর্মচারী ছিল না। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসর পরে আমি ধর্মমহামাত্র নামক কর্মচারী নিয়োগ করেছি। তারা যবন, কম্বোজ ও গন্ধারগণ, পুরুষানুক্রমিক রাষ্ট্রিকেরা এবং অন্যান্য যারা অপরান্তবাসী তাদের জনপদসমূহে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা, ধর্মবৃদ্ধি এবং জনগণের হিত ও সুখের জন্য ব্যাপৃত রয়েছে। শূদ্র ও বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, অনাথ এবং বৃদ্ধগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য এবং ধর্মশীল বন্দীদের মুক্তির জন্য তারা ব্যাপৃত আছে। কারাগারে বন্দীদের মধ্যে—যাদের বহুসংখ্যক পুত্রকন্যা আছে তাদের অর্থদান, যারা অন্যের প্ররোচনায় অপরাধ করেছে তাদের শৃঙ্খলবন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং বৃদ্ধগণকে কারা থেকে মুক্তি দান—এইসব কার্যে ধর্মমহামাত্রেরা ব্যাপৃত আছে। তারা এখানে[১] এবং বাহিরের অন্য নগরসমূহে আমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের ও অন্যান্য আত্মীয়দের গৃহে সর্বত্র ব্যাপৃত আছে। আমার সেই ধর্মমহামাত্রেরা আমার রাজ্যের সর্বত্র[২] ধর্মশীলদের মধ্যে ব্যাপৃত থেকে দেখছে কে ধর্ম আশ্রয় করে আছে, কার মধ্যে ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কে দানশীল।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ধর্মলিপিটি লেখা হয়েছে যেন এটা চিরস্থায়ী হয় এবং আমার বংশধরেরা যেন এটা মেনে চলে।

১০। ষষ্ঠ মুখ্য গিরিশাসন

[গির্নারের পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরকম কথা বলেছেন।—

বহুকাল অতীত হয়েছে সেসময় রাজগণ সর্বদা রাজকার্য করতেন না।

১ এই কথাটির স্থলে গির্নারের পাঠে আছে 'পাটলিপুত্রে'।

২ এ স্থলে ধৌলির পাঠে আছে 'সমস্ত পৃথিবীতে'।

এবং দূতেরা সবসময় তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য নিবেদন করত না। কিন্তু আমি এইরূপ ব্যবস্থা করেছি যেন প্রতিবেদকেরা যেকোনও সময়ে যেকোনও স্থানে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনগণসম্পর্কিত তাদের যেকোনও বক্তব্য আমার নিকট উপস্থাপিত করতে পারে। তখন আমি যেভাবেই ব্যাপৃত থাকি—হয়ত আমি ভোজন করছি, অথবা অন্তঃপুরে বিশ্রাম করছি, অথবা গুপ্তগৃহে মন্ত্রণা করছি, অথবা পদব্রজে ভ্রমণ করছি, অথবা যানবাহনে ভ্রমণ করছি, অথবা একস্থান থেকে অন্যত্র যাত্রা করছি,[১] সেজন্য তাদের দ্বিধা করতে হবে না। জনসাধারণের কাজ আমি সব স্থানেই করব।

আমি যদি মৌখিকভাবে কোন আজ্ঞা দেই—সেটা দানবিষয়ক কিংবা ঘোষণাবিষয়ক যাই হোক, অথবা যদি মহামাত্রগণের সম্মুখে কোনও জরুরী কাজ উপস্থিত হয় এবং সেসব বিষয়ে যদি মন্ত্রিপরিষদে কোনও বাদ-প্রতিবাদ কিংবা কোনও কিছুর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন ঘটে, তবে সে-বিষয় স্থান এবং কালের কথা না ভেবে আমাকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

আমি এই আদেশ প্রচার করেছি।

কর্মোদ্যম এবং জনসাধারণের কল্যাণমূলক রাজকার্য যত করি, তাতে আমার সন্তোষলাভ হয় না। সকল লোকের মঙ্গলই আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। আর তার মূলে রয়েছে এই কর্মোদ্যম এবং রাজকার্যসম্পাদন। সমস্ত জনগণের মঙ্গল সাধনের চেয়ে আমার আর কোন বৃহত্তর কর্ত্তব্য নেই। আমি যত কিছু চেষ্টা করি, তার উদ্দেশ্য এই যেন জীবজগতের কাছে আমার ঋণ পরিশোধিত হয়। আমি যেন ইহলোকে তাদের সুখী করতে পারি, পরলোকেও যেন তারা স্বর্গ লাভ করে।

তাই এই উদ্দেশ্যে আমি বর্ত্তমান ধর্মলিপিটি লিখিয়েছি যেন এটা চিরস্থায়ী হয় এবং আমার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ যেন এটিকে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য অনুসরণ করে চলে। অত্যন্ত বেশীমাত্রায় উদ্যমশীল না হলে এ কাজ দুষ্কর।

---

১ এখানে মূলের 'উদ্যান' শব্দে অনেকে প্রমোদবন বুঝেছেন।

১১। সপ্তম মুখ্য গিরিশাসন

[শাহ্‌বাজগঢ়ীর পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা এই যে, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের অনুসরণকারী প্রজাগণ কোনও অঞ্চলবিশেষে বাস না করে সর্বত্র মিলে-মিশে বাস করুক। তারা সকলেই আত্মসংযম এবং চিত্তশুদ্ধি কামনা করে। কিন্তু মানুষের মনোভাব এক রকম হয় না, তাদের ধর্মাসক্তির পরিমাণও একরূপ হয় না। তাদের মধ্যে কেউ বা কর্তব্যের সমস্তটা পালন করে, কেউ বা তার অংশমাত্র পালন করে। কিন্তু যে ব্যক্তির দানের পরিমাণ বিপুল, তারও যদি আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা এবং গভীর ধর্মাসক্তি না থাকে, তবে সে অত্যন্ত নিম্নস্তরে রয়েছে।

শাহ্‌বাজগঢ়ী পাহাড়ে উৎকীর্ণ খরোষ্ঠী অনুশাসন
(সপ্তম মুখ্য গিরিশাসন)

ডান দিক্‌ থেকে বাম দিকে পঠিতব্য পঙ্‌ক্তিগুলির পাঠ নিম্নরূপ :—

১। দেবনংপ্রিয়ো প্রিয়শি রজ সব্রত্র ইছতি সব্র

২। প্রষংড বসেযু সবে হি তে সযমে ভবশুধি চ ইছংতি

৩। জনো চু উচবুচছংদো উচবুচরগো তে সব্রং একদেশং ব

৪। পি কষংতি বিপুলে পি চু দনে যস নস্তি সযম ভব

৫। শুধি কিট্রঞত ভ্রিঢভতিত নিচে পঢং

১২। অষ্টম মুখ্য গিরিশাসন

[গির্নারের পাঠ।]

বহুকাল অতীত হয়েছে, সেই অতীত সময়ে রাজগণ বিহারযাত্রা করতেন। তাতে মৃগয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হত। কিন্তু দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা তাঁর অভিষেকের দশ বৎসর পর সম্বোধিতে (মহাবোধি বা বোধগয়ায়) গেলেন এবং তখন থেকে তীর্থে-তীর্থে ধর্ম-যাত্রার সূচনা হল। এতে যা ঘটে তা এই—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের দর্শন পাওয়া যায় এবং তাঁদের অর্থ দান করা সম্ভব হয়; বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দর্শন মেলে এবং তাদের ধনদান করা যায়; গ্রামাঞ্চলের জনগণের দর্শন পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে ধর্মের প্রচার ও সেই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ সম্ভব হয়।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার এটাই এখন পরমানন্দ। অন্য সব আনন্দ এর কাছে তুচ্ছ।

১৩। নবম মুখ্য গিরিশাসন

[মানসেহ্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই রকমের কথা বলেছেন।—

লোকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে। রোগের আক্রমণ, পুত্রের বিবাহ, কন্যার বিবাহ, সন্তানের জন্ম, প্রবাসযাত্রা—এই সব এবং এই ধরনের অন্যান্য নানা কারণে লোকে বহুবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে। এ সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা নানারকমের অনেক ক্ষুদ্র ও অর্থহীন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে থাকে।

যা হোক, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এতে ফললাভ অল্পই হয়ে থাকে। তবে ধর্মমঙ্গলের অনুষ্ঠান মহাফল বহন করে। এতে এইসব আছে—দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সম্যক্ ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, প্রাণিহত্যার ব্যাপারে সংযম, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে দান। এই সব এবং এই মত অন্যান্য বিষয়ই ধর্মমঙ্গলানুষ্ঠান। তাই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং প্রভু, মিত্র ও পরিচিত এমন কি প্রতিবেশী পর্যন্ত সকলেরই লোককে বলতে হবে, "এটা ভাল; ফললাভ পর্যন্ত এই মঙ্গলানুষ্ঠানই কর্তব্য।" "ফলপ্রাপ্তি হলেও এই মঙ্গলানুষ্ঠান করব"—

এই কথা বলতে হবে। অন্যরূপ যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে, তাতে ফল লাভ হবেই এরূপ নিশ্চয়তা নেই। তাতে ফল পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে। অধিকন্তু ফলপ্রাপ্তি ঘটলেও, সে ফল কেবল ইহলোকের জন্য। কিন্তু এই ধর্ম-মঙ্গলানুষ্ঠান কালনিরপেক্ষ। যদি এই অনুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি ইহলোকে না ঘটে, তা হলেও এর ফলে পরলোকে অনন্ত-পুণ্যের সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি অনুষ্ঠানের ফল ইহলোকে পাওয়া যায়, তা হলে দুটি ফললাভ হল। ইহলোকেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, ধর্মমঙ্গলানুষ্ঠানের ফলে পরলোকেও অনন্ত-পুণ্যের সৃষ্টি হল।

[গিরনারের পাঠ—শেষাংশ।]

লোকে বলে, "দান সৎকার্য"। কিন্তু অন্য কোনওরূপ দান বা অনুগ্রহ ধর্মদান ও ধর্মানুগ্রহের মত ফলপ্রসূ নয়। অতএব বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়স্বজন কিংবা সহযোগী—যেই হোক, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে, "এটা করা উচিত; এটা সৎকার্য; এর ফলে স্বর্গলাভ হয়।" যার ফলে স্বর্গগমন সম্ভব হয়, তার চেয়ে ভাল করণীয় কাজ আর কি হতে পারে?

১৪। দশম মুখ্য গিরিশাসন

[গিরনারের পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা একটি ব্যাপার ছাড়া ইহলোকে যশ এবং পরলোকে কীর্তি মহার্থাবহ মনে করেন না। সেটি হল এই যে, বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ কালে তাঁর প্রজাগণ যেন ধর্মের অনুগামী হয় এবং তাদের কাজকর্মে ধর্মের নির্দেশ অনুসরণ করে। কেবল এই জন্যই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ এবং কীর্তি আকাঙ্ক্ষা করেন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যে কোনও ব্যাপারে উদ্যমশীল হন, সে সকলই পারলৌকিক উদ্দেশ্যে। যেন সকল লোকের পরিস্রব (নৈতিকদোষ) অল্পমাত্র হয়। পরিস্রবের অর্থ পাপ। দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণীর লোক উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত বেশীমাত্রায় উদ্যমশীল না হলে

পাপের অল্পতা ঘটানো দুষ্কর। উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষে কাজটি

১৫। একাদশ মুখ্য গিরিশাসন

[কাল্‌সীর পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরকম কথা বলেছেন।—

ধর্মদানের মত এমন আর কোনও দান নেই। অধর্ম থেকে ধর্মকে বিভাগ করার মত এমন আর কোনও বিভাজন নেই। ধর্মসম্বন্ধের মত আর কোনও সম্বন্ধও নেই। ধর্মে এই সব আছে—দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার; মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা; মিত্র, পরিচিত ও আত্মীয়স্বজন এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান; এবং জীবহত্যা না করা।

একথা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভু, মিত্র ও পরিচিত ব্যক্তি, এমন কি প্রতিবেশী পর্যন্ত সকলেরই বলতে হবে, "এটা সৎকাজ; এটা করতে হবে। এই ভাবে কাজ করলে ইহলোকেও কিছু ফললাভ হয়, সেই ধর্মদান থেকে পরলোকেও অনন্ত-পুণ্যের সৃষ্টি হয়।"

১৬। দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসন

[শাহ্‌বাজগঢ়ীর পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা প্রব্রজিত ও গৃহস্থ-নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে দান ও অন্যান্য নানারূপ সম্মান দ্বারা মান্য করে থাকেন। কিন্তু দান ও সম্মানকে দেবপ্রিয় তত মূল্যবান্ মনে করেন না। তিনি চান যেন সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধর্মের সার বৃদ্ধি পায়।

এই সারবৃদ্ধি নানা প্রকারের হতে পারে। কিন্তু তার মূল হল বাক্-সংযম[১]। অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের

১ মূলের 'সংযম' কথাটি আমরা বাক্-সংযম অর্থে বুঝেছি। দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসনের অন্যান্য সংস্করণে যে প্রাকৃত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে সাধারণতঃ সমবায় বা মেলামেশা বোঝা হয়; কিন্তু আমরা বুঝেছি 'সমবাদ' বা 'সারবাদ' অর্থাৎ বাক্-সংযম।

নিন্দা যেন সামান্য কারণে কখনও কেউ না করে। আর গুরুতর কারণ থাকলেও যেন তা সামান্যমাত্রই করা হয়।

নানা প্রকারে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর্তব্য। যে এরূপ করে, সে আপন সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটায় এবং অন্য সম্প্রদায়গুলিরও উপকার করে। যে এর অন্যথা করে, সে নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে, পর-সম্প্রদায়েরও অপকার করে। যদি কেউ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিবশতঃ "সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করব" ভেবে আপন সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং পর-সম্প্রদায়ের নিন্দা করে, সেই কাজের দ্বারা সে নিজ সম্প্রদায়ের গুরুতর ক্ষতি করে থাকে। তাই এ বিষয়ে বাক্‌সংযম ভাল। অর্থাৎ লোকে যেন অন্য-ধর্মের বাণী শোনে এবং শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এটাই দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা যেন সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন ধর্মমতের বিষয়ে জানে এবং তার ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়। যারা ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত, তাদের বলতে হবে, "দেবপ্রিয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে দান ও সম্মান প্রদর্শন তত মূল্যবান্ মনে করেন না। তিনি চান যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মনে ধর্মভাবের সার বর্ধিত হোক।"

এই উদ্দেশ্যে তিনি বহুসংখ্যক ধর্ম-মহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্র, ব্রজভূমিক এবং অন্যান্য কর্মচারীর শ্রেণীকে নিযুক্ত করেছেন। এর ফল এই যেন নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়, ধর্মেরও ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

[কান্দাহারের পাঠ ।]

[দ্বাদশ মুখ্য গিরিশাসনের সারাংশ গ্রীক ভাষায় অশোকের যবন-জাতীয় প্রজাগণের উদ্দেশ্যে এখানে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তার প্রথমার্ধ-মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।]

[প্রিয়দর্শী চান] বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধর্মভাব ও আত্মসংযম। লোকের পক্ষে আত্মসংযম সহজ হয় যদি তাদের বাক্‌সংযম থাকে। তারা যেন কোনও কারণেই নিজেদের প্রশংসা এবং অপরের নিন্দা না করে। এইরূপ ব্যবহারের ফলে তাদের মহত্ত্ব বাড়ে এবং

অন্যসব লোকেরা তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়। এর অন্যথা করলে, লোকের কলঙ্ক রটে এবং অন্যেরা তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়। যারা আত্মপ্রশংসা করে এবং অন্য সম্প্রদায়সমূহের নিন্দা করে, তাতে তাদের কেবল অহংকার প্রকাশ পায়। অন্যদের অপেক্ষা নিজেদের বড় করে দেখাবার চেষ্টায় তারা বরং নিজেদের ক্ষতিই করে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উচিত এবং প্রত্যেকের পক্ষেই অন্য ধর্মাবলম্বীর কাছ থেকে কিছু শিক্ষা করা উচিত। এরকম করলে অন্যান্যের জ্ঞান লাভের ফলে তাদের সকলের জ্ঞান বর্ধিত হবে। এইরূপ ব্যবস্থা করার জন্য বারবার বলতে কারও দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে তারা সর্বদা ধর্মপথে চলতে পারবে।

১৭। ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসন

[শাহ্‌বাজগঢ়ীর পাঠ।]

রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কলিঙ্গদেশ জয় করেন। সে সময় সে দেশ থেকে দেড় লক্ষ মনুষ্য ও পশুকে ধরে নিয়ে আসা হয়, এক লক্ষ সেখানে যুদ্ধে নিহত হয় এবং তার বহুগুণ নানাভাবে মৃত্যুবরণ করে। তারপর কলিঙ্গদেশ অধিকৃত হলে দেবপ্রিয় এখন তীব্রভাবে ধর্মাচরণ[১] করছেন; তাঁর ধর্মের পিপাসা এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও অত্যধিক হয়েছে। এর কারণ এই যে, কলিঙ্গদেশ জয় করে দেবপ্রিয়ের অনুশোচনা জন্মেছে।

কোনও অবিজিত দেশ জয় করতে গেলে সেখানে যত মানুষ নিহত হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বন্দী অবস্থায় নির্বাসিত হয়, তা আজ দেবপ্রিয় অত্যন্ত বেদনার বিষয় ও গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করেন। দেবপ্রিয়ের কাছে তার চেয়েও গুরুতর বিষয় হচ্ছে এই যে, সে-দেশের অধিবাসী যে সকল ব্রাহ্মণ, শ্রমণ এবং নানা সম্প্রদায়-ভুক্ত যে-সব গৃহস্থের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি বাধ্যতা, মাতাপিতার বাধ্যতা, গুরুজনের বাধ্যতা, মিত্র, পরিচিত, সহযোগী ও আত্মীয়-স্বজন এবং ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার ও দৃঢ় অনুরাগ

---
[১] কোথাও কোথাও এস্থলে আছে—'ধর্মের আলোচনা'।

প্রভৃতি ধর্মগুণ সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে সব ব্যক্তিকেও আহত বা নিহত হতে হয় এবং তাদেরও প্রিয়জনের নির্বাসন ঘটে। আবার যারা বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, সহযোগী ও আত্মীয়-স্বজনেরপ্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করে, তারা নিজেরা বিপদ্ থেকে মুক্ত থাকলেও, ওদের যদি বিপদ্ ঘটে, সেটা তাদেরও আঘাত করে। যুদ্ধবিগ্রহের সময় সকল মানুষের ভাগ্যেই এরূপ ঘটে থাকে এবং এটা এখন দেবপ্রিয় গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করেন। এমন লোক নেই যে কোনও একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করে না।[১] তাই যত সব লোক তখন কলিঙ্গদেশে নিহত, মৃত্যুমুখে পতিত ও বন্দী অবস্থায় নির্বাসিত হয়েছিল, তার শতভাগ বা সহস্রভাগের বিপদ্‌ও আজ দেবপ্রিয় গভীর বেদনার বিষয় মনে করেন।

কেউ যদি অপকার করে তবে দেবপ্রিয় সেটা ক্ষমা করা উচিত বলে মনে করেন, যদি তাঁর পক্ষে তা ক্ষমা করা সম্ভব হয়। দেবপ্রিয়ের রাজ্যে যে সব অরণ্যবাসী আছে, তাদেরও তিনি অনুনয় করেন এবং বোঝাতে চান। অনুতপ্ত হলেও দেবপ্রিয়ের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, একথা তাদের বলা হয়, যেন তারা অন্যায় কাজ করতে সঙ্কুচিত হয় এবং অন্যায় করে মারা না যায়। দেবপ্রিয় চান, সমস্ত জীবলোকের কোনওরূপ ক্ষতি না হয় এবং তাদের প্রতি ব্যবহারে সংযম ও তাদের অপরাধের বিচারে অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয়।

দেবপ্রিয় এখন ধর্মবিজয়কেই শ্রেষ্ঠ বিজয় মনে করেন। সেই ধর্মবিজয় দেবপ্রিয় এদেশে লাভ করেছেন এবং সমস্ত অন্ত(প্রত্যন্ত)-দেশে ছয়শত যোজন পর্যন্ত স্থানে লাভ করেছেন যেখানে যবনরাজ অন্তিয়োক এবং সেই অন্তিয়োকেরও পরে আর যে চারজন রাজা

১ অন্যত্র এখানে এইরূপ আছে—"যবনদেশ ব্যতীত এমন আর কোনও জনপদ নেই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—এই সম্প্রদায় দুটি নেই। আবার কোনও জনপদেই এমন কোনও স্থান নেই যেখানে লোকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত নয়।" মজ্ঝিমনিকায়েও বলা আছে যে, যবনও কম্বোজদেশে আর্য এবং দাস এই দুটি বর্ণ আছে, অর্থাৎ চতুর্বর্ণ নেই।

আছেন—যাঁদের নাম তুরময়, অন্তিকিনি, মকা ও অলিকসুন্দর, আর নিম্নদিকে চোল ও পাণ্ড্য জনপদ, এমনকি তাম্রপর্ণী পর্যন্ত। সেইরকম এখানে নিজের রাজ্যমধ্যে যবন ও কম্বোজদের দেশে, নাভক ও নাভপঙ্‌ক্তিদের দেশে ভোজনামক জাতির জনপদে এবং অন্ধ্র ও পুলিন্দগণের দেশে—সর্বত্রই দেবপ্রিয়ের ধর্মানুশাসন অনুসরণ করা হচ্ছে। যেসব দেশে দেবপ্রিয়ের দূতগণ যেতে পারে নি, সেখানেও লোকে দেবপ্রিয়ের ধর্মাচরণ, ধর্মের নিয়মাবলী এবং ধর্মপ্রচারের কথা শুনে ধর্মের অনুসরণ করছে এবং করতে থাকবে।

এর ফলে যা লাভ হয় সর্বত্রই সে বিজয় বিজেতা ও বিজিতের প্রীতিরসে স্নিগ্ধ। এই প্রীতিলাভ ধর্মবিজয়ের ফল। অবশ্য এই প্রীতিও সামান্য বিষয়। কিন্তু এর চেয়েও যে মহাফললাভ দেবপ্রিয়ের বাঞ্ছিত সেটা এই যে, ধর্মবিজয়ের ফলে লোকের পারলৌকিক সুখের ব্যবস্থা হয়।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ধর্মলিপি লিখিত হয়েছে। আমার পরে আমার পুত্র ও প্রপৌত্র যারা রাজত্ব করবে তারা যেন যুদ্ধ করে নূতন দেশ জয় করতে হবে, এরূপ ধারণা পোষণ না করে। যদিই বা তা করে, তবে নবজিত দেশে যেন তারা ক্ষমা ও অল্পদণ্ডদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করে। তারা যেন ধর্মবিজয়কেই প্রকৃত দেশজয় বলে মনে করে। কারণ তার ফলে সকলেই ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ করে। ধর্মকাজের আনন্দই যেন তাদের সমস্ত আনন্দের মধ্যে প্রধান হয়। কারণ ধর্মের আনন্দ কেবল ইহলোকের নয়, পরলোকেও তার ভোগ আছে।

[কান্দাহারের পাঠ।]

[ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের সারাংশ গ্রীক ভাষায় অশোকের যবনজাতীয় প্রজাগণের জন্য এখানে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তার প্রথমার্ধমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।]

প্রিয়দর্শী অষ্টম রাজ্যবর্ষে কলিঙ্গদেশ জয় করেন। দেড় লক্ষ লোক সেখান থেকে বন্দী অবস্থায় নীত হয়, এক লক্ষ সেখানে নিহত হয় এবং

প্রায় ততলোক নানাভাবে মৃত্যুবরণ করে। সেই সময় থেকে তাঁর দুঃখ ও দয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সেই ঘটনার দ্বারা অভিভূত হয়েছেন। তিনি যেমন জীবহত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ নিষেধ করেছেন, তেমনই লোকের ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী হয়েছেন।

যেজন্য রাজা আরও বেশী বেদনা বোধ করেছেন, সেটা এই। সে দেশে যে সব ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য ধার্মিক লোক বাস করত, তারা দেশের রাজার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিল এবং শিক্ষাগুরু এবং পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল ; তারা বন্ধুবান্ধব ও সহযোগীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ও শঠতাহীন ব্যবহার এবং ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণের প্রতি অকঠোর ব্যবহার করত। এইরূপ সাধুপ্রকৃতির লোকদের মধ্যে কোন একজন যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়, তবে তার জন্য অন্য সকলেও পরোক্ষভাবে দুঃখ-পীড়িত হয়। আমাদের রাজা এজন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

১৮। চতুর্দশ মুখ্য গিরিশাসন

[গিরনারের পাঠ।]

এই ধর্মলিপিটি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা লিখিয়েছেন।—

ধর্মলিপিগুলির মধ্যে কতকগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লেখা, কতকগুলি বিস্তৃতভাবে এবং কতকগুলি মধ্যমভাবে। সকল বিষয় সর্বস্থানে কাজে লাগানো হয় নি। আমার রাজ্য সুবিস্তৃত, লেখাও হয়েছে অনেক এবং আরও কিছু অবশ্যই লিখব।

ধর্মলিপিগুলিতে কোনও কোনও বিষয় পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। কারণ সেগুলি মাধুর্যমণ্ডিত। এর উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সেগুলি আপনাদের জীবনে অনুসরণ করুক। এমন কোনও বিষয় থাকতে পারে যা অসম্পূর্ণ-ভাবে লিখিত হয়েছে। কারণ হয়ত স্থানবিশেষের পক্ষে সেগুলি অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে অথবা বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করার কোন কারণ ছিল কিংবা হয়ত লিপিকরের ত্রুটিতে এমন ঘটেছে।

১৯। পঞ্চদশ মুখ্য গিরিশাসন

[জৌগড়ার পাঠ।]

[এই অনুশাসনটি কেবল ধৌলি ও জৌগড়াতে আছে। প্রাচীন কলিঙ্গদেশের এই দুই স্থানে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের পরিবর্তে যে দুটি স্বতন্ত্র অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, তার প্রথমটি এই। কিন্তু ভ্রমক্রমে সাধারণতঃ এটিকে দ্বিতীয় 'স্বতন্ত্র গিরিশাসন' বা দ্বিতীয় 'কলিঙ্গানুশাসন' বলা হয়।]

দেবপ্রিয় এই রকমের কথা বলেছেন।—

সমাপা নগরীতে অধিষ্ঠিত মহামাত্রগণকে এই রাজবচন বলতে হবে।—

যা কিছু আমি ভাল দেখি, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি যেন কার্যে সেটা সম্পাদন করি এবং সদুপায় দ্বারা সেই কার্য সিদ্ধ করি। এ ব্যাপারে তোমাদিগকে পরামর্শ দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে আমার মনে হয়।

সকল মনুষ্য আমার সন্তান। যেমন আমার সন্তানগণের সম্পর্কে আমি চাই যে, তারা যেন ইহলোকে ও পরলোকে সর্বরকমের হিত ও সুখ লাভ করে, সেইরূপ সমস্ত মানুষের বেলাতেও আমি ঐ একই ইচ্ছা পোষণ করি।

আমার সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত অবিজিত অন্তের (অর্থাৎ প্রত্যন্ত বা প্রতিবেশী জনপদের লোকেদের) মনে হতে পারে, "রাজা আমাদের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন?" আমার এই ইচ্ছা, তোমরা সেই প্রত্যন্তবাসীদের মনে দৃঢ় করাবে—"রাজা এই চান যে, তোমরা আমার সম্বন্ধে অনুদ্বিগ্ন ও আশ্বস্ত হও ; আমার কাছ থেকে তোমরা কেবল সুখই পাবে, কখনও দুঃখ পাবে না।" একথাও যেন তারা মনে করে, "যতটা ক্ষমা করা সম্ভব, রাজা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" আমি শুধু চাই যে, আমার কথা মনে করে তারা ধর্মাচরণ করুক এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখী হোক।

এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং এতদ্দ্বারা

তাদের প্রতি আমার ঋণ শোধ করছি। তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এবং আমার মনোভাব, দৃঢ়সংকল্প ও অটলপ্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে আমি প্রত্যন্তবাসীর সম্বন্ধে নিজেকে অঋণী বোধ করছি।

তোমরা এতদনুসারে কাজ করে যাবে। প্রত্যন্তবাসীদের আশ্বস্ত করবে। তারা যেন বোঝে, "রাজা আমাদের পিতার মত। তিনি নিজের প্রতি যেমন, সেই মতই আমাদের প্রতিও কৃপাশীল। রাজার কাছে আমরা ঠিক তাঁর পুত্রের মত।"

তোমাদিগকে এই পরামর্শ দিয়ে এবং আমার মনোভাব, দৃঢ়সংকল্প ও অটলপ্রতিজ্ঞার বিষয় জানিয়ে আমি মনে করছি যে, এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা সকল দেশে প্রচারিত হবে। সেই প্রত্যন্তবাসীদের আশ্বস্ত করতে এবং তাদের ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক হিত ও সুখের বিধান করতে তোমরাই সমর্থ। আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করলে তোমরা স্বর্গলাভ করবে এবং ভৃত্য হিসাবে আমার কাছে তোমাদের যে ঋণ আছে, তাও পরিশোধিত হবে।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ধর্মলিপি লেখা হয়েছে যেন মহামাত্রগণ প্রত্যন্ত-বাসীদের আমার সম্পর্কে আশ্বস্ত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে ধর্মাচরণ বৃদ্ধির জন্য সব সময় এই লিপি অনুসরণ করে। এই লিপিটি তোমাদের সকলের চাতুর্মাসীর দিনে এবং তিষ্যানক্ষত্রে শুনতে হবে। চাতুর্মাসী ও তিষ্যানক্ষত্রের মধ্যবর্তী সময়েও সুযোগ পেলেই একা-একাও শুনবে। এই আদেশ অনুসরণ করলে তোমরা তোমাদের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে সজাগ থাকতে পারবে।

২০। ষোড়শ মুখ্য গিরিশাসন

[ধৌলির পাঠ।]

[এই অনুশাসনটি কেবল প্রাচীন কলিঙ্গদেশে অবস্থিত বর্তমান ধৌলি ও জৌগড়াতে পাওয়া গিয়েছে। এই দুটি স্থানে অন্যান্য স্থানের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনের পরিবর্তে যে দুটি স্বতন্ত্র অনুশাসন দেখা যায়, এ তার দ্বিতীয়টি। কিন্তু এটাকে ভ্রমক্রমে প্রথম 'কলিঙ্গের অনুশাসন' অথবা প্রথম 'স্বতন্ত্র গিরিশাসন' বলা হয়।]

দেবপ্রিয়ের বচনে তোসলীতে অধিষ্ঠিত নগর-ব্যবহারক (নগরের বিচারকার্যে নিযুক্ত) মহামাত্রগণকে বলতে হবে।—

আমি ভাল যা কিছু দেখি, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি যেন সেটা কার্যে সম্পাদন করি এবং সদুপায়ে সেই কার্য সিদ্ধ করি। এই ব্যাপারে তোমাদিগকে পরামর্শ দেওয়াই আমি কার্যসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করি। তোমাদের আমি লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উপর শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছি যেন আমি মানুষের প্রীতি লাভ করতে পারি। সকল মনুষ্য আমার সন্তান। যেমন আপন সন্তানদের সম্পর্কে আমি চাই যে, তারা যেন ইহলোকে ও পরলোকে সমস্তরকম হিত ও সুখ লাভ করে; ঠিক তাই আমি সকল মানুষের বেলাতেও ইচ্ছা করি।

এবিষয়ে আমার উদ্দেশ্য কিরূপ ব্যাপক, তা তোমরা বুঝতে পার না। তোমাদের মধ্যে কেউবা একজন বিষয়টা বুঝতে পার। কিন্তু সেও এর অংশমাত্র বোঝে, সমস্তটা বোঝে না। সরকারী কাজে তোমরা যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হও, এই বিষয়ের প্রতি তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিচারের ব্যাপারে দেখা যায়, কোন একটি লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় অথবা কঠোর শাস্তি পায়। এমন হয় যে, কোন উপায়ে হঠাৎ সে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেল; কিন্তু তার মত বহুলোক কারাগারে দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করতে লাগল। এই রকমের ব্যাপারে তোমাদের দেখতে হবে যেন তোমরা অপক্ষপাত অবলম্বন কর। বিচারকের যেসব দোষ পক্ষপাতহীন বিচারে ব্যাঘাত ঘটায়, সেগুলি হচ্ছে— ঈর্ষা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষিপ্রতা, অনভ্যাস, আলস্য ও ক্লান্তি। তোমাদের দেখতে হবে যেন এইসব দোষ তোমাদের অভিভূত না করে। তার জন্য মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ক্রোধহীনতা এবং ধৈর্য। বিচারকার্যে যে বিচারক ক্লান্তি বোধ করে, সে যথাসময়ে কাজের জন্য উঠতে পারে না; কিন্তু তাকে চলতে হবে, ধৈর্যের সঙ্গে কাজে লেগে থাকতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।

তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই বিষয়টি লক্ষ্য করে থাক, সে অন্য

সবাইকে বলবে, "রাজা যে কর্তব্য নির্দেশ করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করবে না। দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা এই রকম, এই রকম।"

ঠিকভাবে এই কর্তব্য সম্পাদন করলে তোমাদের মহাফল লাভ ঘটবে; তা না করলে মহাবিপদ্। এই কর্তব্য যে না করবে, তার স্বর্গলাভও হবে না, রাজানুগ্রহলাভও ঘটবে না। তোমরা কেউ এই কাজ একমনে না করলে, আমার মনে তাকে অনুগ্রহ দেখাবার অতিরিক্ত আগ্রহ আসবে কোথা থেকে? কিন্তু তোমরা এ কাজ ভালভাবে করলে স্বর্গলাভ করবে, প্রভুহিসাবে আমার কাছে তোমাদের যে ঋণ আছে, তাও পরিশোধিত হবে।

প্রতি তিষ্যানক্ষত্রে এই লিপিটির পাঠ তোমাদের সকলের শুনতে হবে। দুটি তিষ্যানক্ষত্রযুক্ত দিনের মধ্যে সুযোগ ঘটলে মাঝে-মাঝে তোমরা লিপিটি একা-একাও শুনবে। তা করলে তোমরা কর্তব্য-সম্পাদনে উৎসাহিত হবে।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমান লিপিটি এখানে লিখিত হয়েছে যেন বিচারকেরা সব সময় আমার অনুশাসন অনুসরণ করে, যেন লোকে হঠাৎ কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হয়, এবং যেন লোককে হঠাৎ যন্ত্রণা ভোগ না করতে হয়।

এই উদ্দেশ্যে আমি এক-একজন মহামাত্রসংজ্ঞক কর্মচারীকে প্রতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার প্রজাগণের মধ্যে ভ্রমণে পাঠাব, যে-কর্মচারীর ব্যবহার কর্কশ, চণ্ড বা কঠোর হবে না। সে দেখবে যে, নগরের বিচারকগণ আমার অনুশাসন অনুসারে কাজ করছে কিনা। উজ্জয়িনীতে অধিষ্ঠিত কুমারও প্রতিবৎসর সেখান থেকে একদল কর্মচারীকে মফস্বলে পাঠাবে এবং প্রতিবৎসর না পাঠাতে পারলেও তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার অবশ্যই পাঠাবে। এই ভাবে তক্ষশিলা থেকেও একদল কর্মচারী মফস্বলে প্রেরিত হবে।

যখন প্রতিবৎসর মহামাত্রেরা গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হবে, তখন আপন-আপন কাজের সঙ্গে তাদের এও জানতে হবে যে, বিচারক কর্মচারীরা রাজার অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করছে কিনা।

গ. গুহালেখ

২১। প্রথম গুহালেখ

[এই লেখটি বরাবর পাহাড়ের গায়ে পাথর কুঁদিয়ে প্রস্তুত একটি নকল গুহার দেওয়ালে পাওয়া গিয়েছে। গুহাটিকে এখন 'সুদামা গুহা' বলা হয়; কিন্তু প্রাচীনকালে এটির নাম ছিল 'ন্যগ্রোধ-গুহা'। 'ন্যগ্রোধ' অর্থ বটবৃক্ষ।]

রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পর রাজা প্রিয়দর্শী এই ন্যগ্রোধ-গুহা আজীবিকসম্প্রদায়ের সাধুগণের উদ্দেশ্যে দান করেছেন।

২২। দ্বিতীয় গুহালেখ

[বরাবর পাহাড়ের অন্য একটি নকল গুহাতে বর্তমান লেখটি পাওয়া গিয়েছে। গুহাটিকে এখন 'বিশ্বঝোপড়ী' বলা হয়।]

স্খলতিক পর্বতে নির্মিত এই গুহা রাজা প্রিয়দর্শীর দ্বারা তাঁর রাজ্যাভিষেকের বার বৎসর পর আজীবিকসম্প্রদায়ের সাধুগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হল।

২৩। তৃতীয় গুহালেখ

[এই লেখটি বরাবর পাহাড়ের অপর একটি নকল গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে। গুহাটির বর্তমান নাম 'কর্ণ চৌপার গুহা'।]

রাজ্যাভিষেকের উনিশ বৎসর পর রাজা প্রিয়দর্শী তাঁর প্রিয় এই স্খলতিকপর্বতে নির্মিত গুহাটি সাধুগণের বর্ষাবাসের জন্য দান করেছেন।

দ্বিতীয়াংশ

(ক) ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন

২৪। প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন

[এলাহাবাদ-কোসামের পাঠ। শাসনটি সাঁচী এবং সারনাথেও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোনও স্থানেই এটিকে অক্ষত পাওয়া যায় নি।]

দেবপ্রিয় আদেশ দিচ্ছেন।—

কৌশাম্বীতে অধিষ্ঠিত মহামাত্রগণকে একথা বলতে হবে।

আমি ভিক্ষুসংঘ এবং ভিক্ষুণীসংঘের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে সংঘ-দুটিকে অখণ্ড করেছি। কোনও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ভিক্ষুকে সংঘে ঢোকানো হবে না। যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘের অখণ্ডতা নষ্ট করবে, তাদিগকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর অনুপযুক্ত শ্বেতবসন পরতে এবং সাধারণ বাড়ীতে বাস করায় বাধ্য করতে হবে।

[সাঁচীর পাঠ।—এখানে শাসনের সূচনায় অবশ্যই সাঁচীতে অধিষ্ঠিত মহামাত্রগণের উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রথমাংশের অক্ষরগুলি বিনষ্ট।]

তোমাদিগকে দেখতে হবে যেন বিরুদ্ধবাদী ভিক্ষুরা সংঘে অনৈক্যের সৃষ্টি না করতে পারে। যতকাল আমার পুত্র-প্রপৌত্রাদি রাজত্ব করবে এবং আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠবে ততকালের জন্য আমি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘকে অনৈক্যহীন করেছি।

কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী যদি অনৈক্য সৃষ্টি করে সংঘ ভাঙে, তবে তাকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর অনুপযুক্ত শ্বেতবসন পরতে এবং সাধারণ গৃহে বাস করায় বাধ্য করতে হবে।

আমি চাই যে, সংঘ অখণ্ড এবং চিরস্থায়ী হয়।

[**সারনাথের পাঠ।**]

[এখানে শাসনের প্রথমাংশে অবশ্যই সারনাথে অধিষ্ঠিত মহামাত্রগণের উল্লেখ ছিল। কিন্তু সে অংশ ভেঙে গেছে।]

তোমরা দেখবে যেন কেউ সংঘ না ভাঙতে পারে। যদি কোন

ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ ভাঙে, তবে তাকে সাধারণ মানুষের উপযুক্ত শ্বেতবসন পরিয়ে সাধারণ গৃহে বাস করতে বাধ্য করবে।

আমার এই আজ্ঞা এইভাবে ভিক্ষুসংঘ এবং ভিক্ষুণীসংঘে বিজ্ঞাপিত করবে।

২৫। দ্বিতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন

[এটি প্রকৃতপক্ষে সারনাথ স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রথম ক্ষুদ্র স্তম্ভ-শাসনের শেষাংশ। অন্যত্র এটি পাওয়া যায় নি।]

দেবপ্রিয় এই রকম কথা বলেছেন।—

এই প্রকার একটি লিপি তোমাদের কাছে থাকবে বলে কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। ঠিক এইরূপ আর-একটি লিপি বুদ্ধোপাসকদের জন্য উপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। প্রত্যেক উপবাসদিনে (অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে) উপাসকেরা শাসনটির পাঠ শুনতে যাবে যাতে এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। প্রতি উপবাসদিনে প্রত্যেক মহামাত্র অবশ্যই সেদিনের কর্তব্যহিসাবে শাসনটির কাছে গিয়ে (পাঠ শুনে) তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করবে এবং কর্তব্য বুঝে নেবে। তোমাদের শাসনাধীন আহার (অর্থাৎ বিষয় বা জেলা) যতদূর বিস্তৃত, তার সর্বত্র তোমরা আমার এই শাসনের ব্যঞ্জনা অনুসারে লোক পাঠিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করবে। তোমাদের অধীন যেসব দুর্গবিশেষের সঙ্গে সংলগ্ন পরগনা আছে, সেখানেও অনুরূপভাবে লোক পাঠাতে হবে।

২৬। তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন

[এই শাসনটি এলাহাবাদ-কোসাম শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ। এটি আর কোথাও নেই।]

দেবপ্রিয়ের বচনে বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত মহামাত্রগণকে বলতে হবে।

এখানে যা কিছু আমার দ্বিতীয়া মহিষীর দান—সেটা আম্রবাটিকা হোক কিংবা আরাম হোক কিংবা দানগৃহ হোক কিংবা অন্যকিছু যাই হোক, সে সমস্তই তাঁর। সেগুলি এই ভাবে তাঁর বলে গণ্য করতে হবে—"দ্বিতীয়া মহিষী তীবর-মাতা চারুবাকীর দান।"

(খ) স্তম্ভলেখ

২৭। প্রথম স্তম্ভলেখ

[এই লেখটি রুম্মিনদেঈ স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ।]

রাজ্যাভিষেকের বিশ বৎসর পরে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এখানে স্বয়ং এসে পূজা দেন। কারণ এখানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্মলাভ করেছিলেন। এখানে রাজা শিলাখণ্ডঘটিত প্রাকারাবলী নির্মাণ করান এবং একটি শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত করেন।

রুম্মিনদেঈ স্তম্ভে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলেখ

(প্রথম স্তম্ভলেখ)

𑀤𑁂𑀯𑀸𑀦𑀧𑀺𑀬𑁂𑀦 𑀧𑀺𑀬𑀤𑀲𑀺𑀦 𑀮𑀸𑀚𑀺𑀦 𑀯𑀻𑀲𑀢𑀺𑀯𑀲𑀸𑀪𑀺𑀲𑀺𑀢𑁂𑀦

𑀅𑀢𑀦 𑀆𑀕𑀸𑀘 𑀫𑀳𑀻𑀬𑀺𑀢𑁂 𑀳𑀺𑀤 𑀩𑀼𑀥𑁂 𑀚𑀸𑀢𑁂 𑀲𑀓𑁆𑀬𑀫𑀼𑀦𑀻𑀢𑀺

𑀲𑀺𑀮𑀸𑀯𑀺𑀕𑀟𑀪𑀻𑀘𑀸 𑀓𑀸𑀮𑀸𑀧𑀺𑀢 𑀲𑀺𑀮𑀸𑀣𑀪𑁂 𑀘 𑀉𑀲𑀧𑀸𑀧𑀺𑀢𑁂

𑀳𑀺𑀤 𑀪𑀕𑀯𑀁 𑀚𑀸𑀢𑁂𑀢𑀺 𑀮𑀼𑀁𑀫𑀺𑀦𑀺𑀕𑀸𑀫𑁂 𑀉𑀩𑀮𑀺𑀓𑁂 𑀓𑀝𑁂

𑀅𑀞𑀪𑀸𑀕𑀺𑀬𑁂 𑀘

বাম দিক্ থেকে ডান দিকে পঠিতব্য পংক্তিগুলির পাঠ নিম্নরূপ :—

১। দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন

২। অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে সক্যমুনীতি

৩। সিলাবিগডভীচা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে

৪। হিদ ভগবং জাতেতি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে

৫। অঠভাগিয়ে চ

এখানে ভগবান্ বুদ্ধ জন্মেছিলেন বলে লুম্বিনীগ্রামের বলি-সংজ্ঞক ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া হল এবং উৎপন্ন শস্যের রাজপ্রাপ্য অংশ ছয়ভাগের একভাগস্থলে আটভাগের একভাগ নির্ধারিত করা হল।

২৮। দ্বিতীয় স্তম্ভলেখ

[বর্তমান লেখটি নিগালীসাগরের নিকটে অবস্থিত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা রাজ্যাভিষেকের চতুর্দশ বৎসর পর পূর্ববুদ্ধ কনকমুনির স্তূপটি দ্বিগুণ আকারে বর্ধিত করেন। অভিষেকের বিশ বৎসর পর রাজা স্বয়ং এখানে এসে পূজা দেন এবং একটি শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত করেন।

(গ) মুখ্য স্তম্ভশাসন

২৯। প্রথম মুখ্য স্তম্ভশাসন

[দিল্লী-তোপ্‌রার পাঠ।]

[ছয়টি মুখ্য স্তম্ভশাসনের পাঠ দিল্লী-তোপ্‌রা ব্যতীত দিল্লী-মেরাঠ, লৌড়িয়া অররাজ, লৌড়িয়া নন্দনগড় এবং রামপুর্‌বাতে প্রাপ্ত স্তম্ভেও উৎকীর্ণ আছে।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

রাজ্যাভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বৎসর পর আমি এই ধর্মলিপি লিখিয়েছি।

যদি ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বেশী মাত্রায় অনুরাগ না থাকে, যদি নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করার ভাব খুব তীব্র না থাকে, গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা যদি অত্যন্ত অধিক না থাকে, তবে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ লাভ সহজ হয় না। আমার ধর্মপ্রচারের ফলে জনগণের মধ্যে ধর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ দিনে-দিনে বেড়েছে এবং আরও বর্ধিত হবে।

শ্রেষ্ঠ, নিম্ন এবং মধ্যম—আমার এই তিন শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্ম অনুসরণ করছে ও ধর্মের বিধান পালন করছে। তারা অপরকে

ধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ। অন্ত(প্রত্যন্ত দেশ)-সম্পর্কে নিযুক্ত আমার মহামাত্রগণও এইরূপ করছে।

কর্মচারীদের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, তারা ধর্মানুসারে প্রজাদের পালন করবে, তাদের বিচারকার্য ধর্মানুসারে সম্পন্ন করবে, ধর্মানুসারে তাদের সুখের ব্যবস্থা করবে এবং ধর্মানুসারে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৩০। দ্বিতীয় মুখ্য স্তম্ভশাসন

[দিল্লী-তোপ্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলেছেন।—

ধর্মাচরণ পুণ্য কাজ। কিন্তু ধর্মবস্তুটি কি? অল্প পাপ, বহু কল্যাণকার্য, দয়া, দান, সত্যবাদিতা এবং শুচিতা—এইগুলিকে ধর্ম বলা যায়।

আমি অনেক প্রকারে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অনেকের চক্ষু দান করেছি। দ্বিপদ-চতুষ্পদের প্রতি এবং পক্ষী ও বারিচরের প্রতি আমি প্রাণদান পর্যন্ত নানাবিধ অনুগ্রহ দেখিয়েছি। অন্যান্য অনেক প্রকারের কল্যাণকার্যও আমি করেছি। এই উদ্দেশ্যে আমি বর্তমান ধর্মলিপি লিখিয়েছি যেন লোকে এই লিপি অনুসরণ করে চলে এবং লিপিটি চিরস্থায়ী হয়। যে এই ধর্মলিপি অনুসরণ করে চলবে, তার পুণ্য লাভ হবে।

৩১। তৃতীয় মুখ্য স্তম্ভশাসন

[দিল্লী-তোপ্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

লোকে কেবল পরের জন্য কি কল্যাণকার্য করেছে, তাই দেখে। ভাবে, "আমি এই কল্যাণকার্য করেছি।" কেউ দেখে না, সে কি পাপ করেছে। কখনও ভাবে না, "আমি এই পাপ কাজ করেছি," অথবা "এই কাজে পাপ হবে।"

এইরূপ পাপ-পর্যবেক্ষণের কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু লোকের অবশ্যই বিষয়টা এইভাবে দেখা উচিত, "চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ

এবং ঈর্ষা—এইগুলি লোককে পাপের পথে নিয়ে যায়। এগুলির জন্য আমি যেন ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হই।”

এই বিষয়টী লোকের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত—“এই কাজ আমার ইহলোকের জন্য, এই কাজ আমার পরলোকের জন্য।”

৩২। চতুর্থ মুখ্য স্তম্ভশাসন

[দিল্লী-তোপ্‌রার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পরে আমি এই ধর্মলিপি লিখিয়েছি।

আমার রাজ্যের জনগণের মধ্যে আমি লক্ষ-লক্ষ জীবের উপর একজন করে রজ্জুক নিযুক্ত করেছি। লোককে পুরস্কার বা দণ্ডদানের ব্যাপারে আমি তাদের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছি। আমার উদ্দেশ্য এই যে, রজ্জুকেরা যেন আশ্বস্তভাবে নির্ভয়ে তাদের কর্তব্য কার্য করে, গ্রামাঞ্চলের জনগণের হিত ও সুখ বিধান করে এবং লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। কিভাবে জনসাধারণকে সুখী করা যায় এবং কিসে তারা দুঃখ পায়, রজ্জুকেরা তা জানবে এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে ধর্মোপদেশ দেবে যেন তারা ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ লাভ করে।

অবশ্য আমার কাজ করতে রজ্জুকদের আগ্রহ আছে। আমার মনোভাব জানে এই রকম রাজপুরুষদেরও তারা বাধ্য থাকবে। সেই রাজপুরুষেরা আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ রজ্জুকগণকে উপদেশ দেবে যেন তারা কাজের দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

কোন অভিজ্ঞা ধাত্রীর হস্তে নিজ সন্তানকে ন্যস্ত করে লোকে যেমন আশ্বস্ত হয়ে ভাবে, “এই অভিজ্ঞা ধাত্রী বেশ ভালভাবে আমার সন্তানটিকে লালন-পালন করতে পারবে,” ঠিক তেমনই আমি গ্রামাঞ্চলের জনগণের হিত ও সুখের জন্য রজ্জুকদের নিযুক্ত করেছি। জনগণকে পুরস্কার দান অথবা তাদের শাস্তিবিধান ব্যাপারে আমি রজ্জুকদিগকে স্বাধীন করে দিয়েছি যেন তারা নির্ভয়ে আশ্বস্ত হয়ে

সানন্দে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। এটাই বাঞ্ছনীয় যেন বিচার-কার্য এবং শাস্তিবিধান ব্যাপারে অসামঞ্জস্য না ঘটে।

এ ব্যাপারে এই পর্যন্ত আমি আদেশ করেছি।—

কারাগারে বন্দী মনুষ্যগণের মধ্যে যাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, আমি তাদিগকে তিনদিন রেহাই দিয়েছি। ঐ সময়ে সেই মনুষ্যদের আত্মীয়স্বজন বিচারকগণের কাছে মৃত্যুদণ্ড-রদের পক্ষে চেষ্টা করতে পারে। অন্যথা মৃত্যুপথযাত্রীদের সান্ত্বনার জন্য তাদের পারত্রিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে দান এবং উপবাস করতে পারে। আমার ইচ্ছা এইরূপ যে, ইহলোকে যাদের বেঁচে থাকার সময় শেষ হয়ে এসেছে, তারাও যেন পরলোকে সুখী হয়। এইভাবে যেন লোকের ধর্মাচরণ, আত্মসংযম এবং সাধারণ দানকার্য থেকে পারলৌকিক সুখের জন্য দানকে পৃথক করে দেখার শক্তি নানারূপে বর্ধিত হয়।

৩৩। পঞ্চম মুখ্য স্তম্ভশাসন

[রামপুরবার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বৎসর পর আমি নিম্নলিখিত জীববর্গকে অবধ্য বলে ঘোষণা করেছি।—(১) শুক, (২) শারিকা, (৩) লালবর্ণের চক্রবাক, (৪) হংস, (৫) নন্দিমুখ, (৬) গৈরাট, (৭) বাদুড়, (৮) আম্রবৃক্ষবাসী পিপীলিকা, (৯) ক্ষুদ্র কচ্ছপ, (১০) অস্থিহীন মৎস্য, (১১) বেদবেয়ক, (১২) গঙ্গাপুৎপুটক, (১৩) সংকুচ-মৎস্য, (১৪) কচ্ছপ, (১৫) সজারু, (১৬) পর্ণ-শশক, (১৭) দ্বাদশশৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ, (১৮) ষাঁড়, (১৯) গৃহস্থিত পোকামাকড়, (২০) গণ্ডার, (২১) শ্বেত-কপোত, (২২) গ্রাম-কপোত এবং (২৩) সমস্ত রকমের চতুষ্পদ যা লোকের কোন কাজে আসে না, লোকে যা খায়ও না।

ছাগলী, মেষী বা শূকরী যদি গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী হয়, তবে তা অবধ্য। তাদের বাচ্চা ছয়মাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত অবধ্য। কুক্কুটকে কেউ খোজা করবে না। তুষের মধ্যে কীট থাকলে কেউ তা পোড়াবে

না। অনর্থকভাবে কিংবা জীবহত্যার উদ্দেশ্যে কেউ অরণ্য অগ্নিদগ্ধ করবে না। জীবদ্বারা কেউ জীব পোষণ করবে না।

কার্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসের তিন চাতুর্মাসী পূর্ণিমায় ও পৌষ-পূর্ণিমায় তিনদিন অর্থাৎ চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্ তিথিত্রয়ে এবং উপবাসদিনে মাছ মারা ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। ঐ দিনগুলিতে হস্তীদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট অরণ্য এবং কৈবর্তগণের ভোগভূমিতে অন্য যে সকল জাতির জীব আছে, তাদেরও কেউ হত্যা করবে না।

বিশেষরূপে পবিত্র অষ্টমী তিথিযুক্ত পক্ষে (মাঘের কৃষ্ণপক্ষে), চতুদর্শীতে, অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, পুষ্যা ও পূর্ণবসু নক্ষত্রে, তিনটি চাতুর্মাসী পূর্ণিমায় এবং শুভদিনে বলদের নিমু'ষ্কীকরণ নিষিদ্ধ। ছাগল, ভেড়া, শূকর এবং অন্যান্য যে সব পশুকে সাধারণতঃ মুষ্কহীন করা হয়, তাদের সম্পর্কেও ঐ নিষেধ। পুষ্যানক্ষত্রে, পুনর্বসুনক্ষত্রে, তিন চাতুর্মাসীতে এবং চাতুর্মাসীর পক্ষে (কার্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে) যেন কেউ ঘোড়া ও বলদের গায়ে দগ্ধ লৌহশলাকার ছেঁকা না দেয়।

রাজ্যাভিষেকের পর পঞ্চবিংশতি বৎসরের সময় মধ্যে আমি পঁচিশবার কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছি।

৩৪। ষষ্ঠ মুখ্য স্তম্ভশাসন

[রামপুরবার পাঠ।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

জনগণের হিত ও সুখ বিধানের উদ্দেশ্যে আমি রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পর প্রথম ধর্মলিপি লিখিয়েছিলাম যেন লিপি অনুসরণ করে তাদের নানাভাবে ধর্মের বৃদ্ধি ঘটে।

"কেবল এইভাবেই লোকের হিত ও সুখবিধান করা সম্ভব"— এই কথা মনে করে আমি ভেবেছি, যারা আমার আত্মীয়স্বজন এবং যেসব লোক আমার রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বা দূর-দূর অঞ্চলে বাস করে, কিভাবে আমার পক্ষে তাদের সুখের ব্যবস্থা করা সম্ভব ও তদনুসারে আমি কি কাজ করতে পারি। সকল শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধেই আমি এইরূপ ভেবেছি।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের আমি নানা প্রকার সম্মান দ্বারা সম্মানিত করেছি। কিন্তু যেকাজটিকে আমি উত্তম বলে মনে করি, সেটি হচ্ছে আমার নিজে গিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

রাজ্যাভিষেকের পঁচিশ বৎসর পর আমি এই ধর্মলিপিটি লিখিয়েছি।

৩৫। সপ্তম মুখ্য স্তম্ভশাসন

[দিল্লী-তোপ্‌রার পাঠ।—এই অনুশাসন অন্য কোনও স্তম্ভগাত্রে পাওয়া যায় নি।]

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

বিগত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে সব রাজা রাজত্ব করে গিয়েছেন, তাঁরা চাইতেন কিভাবে ধর্মবৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের উন্নতি হয়। কিন্তু তাতে লোকের ধর্মবৃদ্ধিজনিত উন্নতি আশানুরূপ হয় নি।

এবিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

এই কথা আমার মনে উঠেছে—"অতীত কালে যেসকল রাজা রাজত্ব করেছেন, তাঁরা চাইতেন কিভাবে তাঁদের প্রজারা ধর্মবৃদ্ধি দ্বারা উন্নত হয়; কিন্তু লোকের আশানুরূপভাবে ধর্মবৃদ্ধিজনিত উন্নতি ঘটে নি।" তাই আমি ভাবলাম, "কেমনভাবে লোকে ধর্মপথে বিচরণ করতে পারে? কেমনকরে লোকে আশানুরূপভাবে ধর্মবৃদ্ধিজনিত উন্নতি ঘটাতে পারে?"

এ বিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

আমার মনে এই কথা উঠল—"আমি ধর্মবিষয়ক ঘোষণা প্রচার করব এবং ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করব। এসব শুনে লোকে ধর্মের অনুবর্তন করবে, উন্নতি লাভ করবে এবং বেশীমাত্রায় ধর্মবৃদ্ধিজনিত উন্নতির অধিকারী হবে।"

এই উদ্দেশ্যে আমি ধর্মবিষয়ক ঘোষণা প্রচারিত করেছি, নানা প্রকার ধর্মোপদেশ প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছি, যার ফলে অগণিত

লোকের উপর নিযুক্ত আমার রাজপুরুষগণপর্যন্ত লোককে ধর্মোপদেশ দান করবে এবং ধর্মের বিস্তার ঘটাবে।

আমার রজ্জুকেরা লক্ষ-লক্ষ জীবের উপর নিযুক্ত। তাদের প্রতিও আমার আদেশ রয়েছে, "এইভাবে, এইভাবে তোমরা ধার্মিক লোকদিগকে উপদেশ দেবে।"

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী এইরূপ কথা বলেছেন।—

এই বিষয়টি মনে রেখে আমি শিলাস্তম্ভে ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করেছি, ধর্মমহামাত্র সংজ্ঞক কর্মচারী নিযুক্ত করেছি এবং ধর্মসম্পর্কিত ঘোষণা প্রচার করেছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

পথে-পথে আমি পশু ও মনুষ্যকে ছায়াদানের জন্য বটবৃক্ষ রোপণ করেছি। আম্রবাটিকা নির্মাণ করেছি। আট[১] ক্রোশ দূরে-দূরে আমি কূপ খনন করিয়েছি এবং বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করিয়েছি। পশু ও মনুষ্যের ভোগের জন্য আমি নানা স্থানে জলসত্র স্থাপন করিয়েছি। কিন্তু এই ভোগের ব্যবস্থার তেমন গুরুত্ব নেই। লোকের এইরূপ সুখের ব্যবস্থা প্রাচীন রাজারাও করেছিলেন, আমিও করেছি। কিন্তু আমার এইরূপ কাজ করার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে এই ধরনের ধর্মাচরণের অনুবর্তন করুক।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

প্রব্রজিত ও গৃহস্থগণের মধ্যে আমার ধর্মমহামাত্রেরা নানারূপ অনুগ্রহমূলক কাজে ব্যাপৃত আছে। তারা সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করছে। আমি ব্যবস্থা করেছি যে, তারা বৌদ্ধ সংঘের জন্য কাজ করবে। সেইরূপ তারা ব্রাহ্মণ ও আজীবিক সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করবে, এ ব্যবস্থাও আমি করেছি। আরও আমি ব্যবস্থা করেছি যে, তারা নির্গ্রন্থদের (অর্থাৎ জৈনদের) জন্য কাজ করবে। আমার ব্যবস্থায় তারা ভিন্ন-ভিন্ন সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য কাজ

১ মূলে ব্যবহৃত শব্দটি থেকে অর্ধক্রোশও বোঝা যেতে পারে। তবে তাতে দুটি বিশ্রাম স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব অস্বাভাবিক রকম কম হয়।

করবে। বিশেষ-বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্য বিভিন্ন ধর্মমহামাত্র ব্যাপৃত থাকবে। যেমন এদের মধ্যে কাজ করবে, তেমনই আমার ধর্মমহামাত্রগণ এখানে অনুল্লিখিত অন্য সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপৃত থাকবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

এরা ছাড়া আরও অন্য অনেক মুখ্য রাজপুরুষ আমার এবং মহিষীগণের দানের ব্যাপারে ব্যাপৃত রয়েছে। এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক, সর্বত্রই তারা আমার পরিবারের সকলের কাছে উপযুক্ত দানের পাত্র সংগ্রহ করে আনছে। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি যে, ধর্মমহামাত্রেরা আমার নিজের পুত্রগণ ও অন্যান্য দেবীদের পুত্রগণের দানকার্যে ব্যাপৃত থাকবে যেন ধর্মসম্পর্কিত মহৎ কার্য এবং ধর্মাচরণ বৃদ্ধি পায়। মহৎ ধর্মকার্য ও ধর্মাচরণ এইগুলি—দয়া, দান, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, মৃদুতা ও সাধুতা। আমার উদ্দেশ্য এই যে, লোকসমাজে এই গুণগুলি বৃদ্ধি পাক।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

আমি যা কিছু সৎকাজ করেছি, লোকে তা অনুকরণ এবং অনুসরণ করছে। নিম্নলিখিত গুণগুলি সম্পর্কে লোকের উন্নতি হয়েছে এবং আরও হবে—মাতাপিতার প্রতি বাধ্যতা, গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা, বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, এবং ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, দীন, অনাথ, এমনকি ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কথা বলেছেন।—

মনুষ্যগণের এই যে ধর্মবৃদ্ধি এটা দুই প্রকারে ঘটেছে—প্রথমতঃ, লোককে ধর্মসম্পর্কিত নিয়মাবলী পালনে বাধ্য করে এবং দ্বিতীয়তঃ, লোককে ধর্মপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে। ধর্মবিষয়ক নিয়মাবলী হচ্ছে এই যেমন আমি ব্যবস্থা করেছি যে, এই-এই জীববর্গ হত্যা করা চলবে না। এইরকম অন্য বহু ধর্মনিয়ম আমার দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু জীবগণের প্রতি হিংসা না করা এবং জীবহত্যা না করা সম্পর্কে আমার

প্রচারকার্যের ফলেই মনুষ্যের ধর্মভাব খুব বেশীমাত্রায় বর্ধিত হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে আমি শিলাস্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করেছি যেন যতদিন আমার পুত্র-প্রপৌত্রগণ রাজত্ব করে ও চন্দ্র-সূর্য আকাশে উদিত হয়, ততদিন পর্যন্ত এটা স্থায়ী হয় এবং লোকে শাসনটির অনুবর্তী হয়। শাসনের অনুবর্তন করলে ইহলোকে এবং পরলোকে মনুষ্যগণের সুখলাভ হবে।

রাজ্যাভিষেকের সপ্তবিংশতি বর্ষ পরে আমি এই ধর্মলিপি লিখিয়েছি।

দেবপ্রিয় এইরূপ কথা বলেছেন।—

যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক পাওয়া যাবে, সেগুলিতে তোমরা এই ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করাবে যেন লিপিটি চিরস্থায়ী হয়।

পরিশিষ্ট

কয়েকটি নাম ও শব্দের পরিচায়িকা

॥ অ ॥

অনাগতভয়ানি—পালিভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নামের সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ। অশোক ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকাদের বিশেষভাবে শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য যে সাতটি গ্রন্থ নির্ধারিত করেছিলেন, এটি তার মধ্যে একটি।

অন্তমহামাত্র—সাম্রাজ্যের সীমান্তের নিকটবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে নিযুক্ত দূতও সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর কর্মচারী ছিল।

অন্তিকিনি, অন্তেকিনি—Macedonia-র রাজা Antigonas Gonatas (২৭৭-২৩৯ খ্রী-পূ)। তাঁর সঙ্গে অশোকের মৈত্রীভাব ছিল।

অন্তিয়োক—পশ্চিম-এশিয়ার সেলেউকস বংশীয় রাজা Antiochus II Theos (২৬১-২৪৬ খ্রী-পূ)। তাঁর সঙ্গে অশোকের মৈত্রী-বন্ধন ছিল।

অন্ধ্র—অশোকের রাজ্যের অধিবাসী জাতিবিশেষ। তারা সম্ভবতঃ দক্ষিণভারতের উত্তরাঞ্চলে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে বাস করত। বর্তমানে তেলেগুভাষীরা নিজেদের আন্ধ্র বলে।

অলিকসুদর, অলিকসুন্দর—গ্রীক রাজা Alexander, হয় Epirus-এর রাজা (২৭২-২৫৫ খ্রী-পূ) অথবা Corinth-এর রাজা (২৫২-২৪৪ খ্রী-পূ)। তাঁর সঙ্গে অশোকের বন্ধুভাব ছিল।

অশোক—মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট (আ ২৭২-২৩২ খ্রী-পূ)। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও আফগানিস্তানের অধিকাংশে বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র অর্থাৎ আধুনিক বিহারের অন্তর্গত পাটনা।

॥ আ ॥

আজীবিক—একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম। এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মস্করীপুত্র গোশাল। তিনি ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

আম্রপিপীলিকা—একশ্রেণীর লাল পিঁপড়ে। সাধারণতঃ এরা আমগাছের ডালে কতকগুলি পাতা জোড়া লাগিয়ে বাসা বাঁধে এবং তাতে অজস্র ডিম পাড়ে। বিহারের কোনও কোনও উপজাতি বাচ্চা ও ডিমশুদ্ধ ঐ পিঁপড়ের বাসা রান্না করে খায়; বাচ্চা ও ডিম কাঁচাও খায়। অশোক আম্রপিপীলিকা অবধ্য ঘোষণা করেন।

আর্যপুত্র—দক্ষিণভারতের এড়্‌ড়গুডির নিকটবর্তী সুবর্ণগিরিতে জনৈক 'আর্যপুত্র' (অর্থাৎ রাজা অশোকের পুত্র) শাসনকর্তা ছিলেন।

আর্যবাসাঃ—পালিভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নামের সংস্কৃত রূপ। অশোক সকল শ্রেণীর বৌদ্ধগণের শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য যে গ্রন্থগুলি নির্ধারিত করেন, তন্মধ্যে একখানি।

॥ ই ॥

ইসিল—ঋষিল দ্রষ্টব্য।

॥ উ ॥

উপুনিথ-বিহার—মাগেমদেশে অবস্থিত একটি বিহারের প্রাকৃত নাম। অবস্থান অজ্ঞাত। নামটি 'ওপুনিথ'ও হতে পারে।

উজ্জয়িনী—বর্তমানে বলা হয় 'উজ্জৈন'। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থিত প্রাচীন নগরী। উজ্জয়িনী অশোকের সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী ছিল বলে বোধ হয়।

উপতিষ্যপ্রশ্নঃ—পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থবিশেষের নামের সংস্কৃত রূপ। অশোক যে সাতটি গ্রন্থের শ্রবণ ও অনুধাবন বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত করেছিলেন, এটি সেগুলির অন্যতম।

॥ ঋ ॥

ঋষিল—কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি-শিদ্দাপুরায় অবস্থিত একটি প্রাচীন নগর। অনুশাসনের ভাষায় নামটির আকার 'ইসিল'। এখানে অশোকের সাম্রাজ্যের একটি শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। তাঁর কয়েকজন মহামাত্রসংজ্ঞক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এখানে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিল।

॥ ও ॥

ওপুনিথ-বিহার—'উপুনিথ-বিহার' দ্রষ্টব্য।

॥ ক ॥

কনকমুনি—জনৈক পূর্ববুদ্ধের নামের সংস্কৃত রূপ। প্রাকৃতে আছে 'কোনাগমন'। নেপাল তরাইতে তাঁর দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। অশোকের যুগে স্থানটি তীর্থরূপে পরিগণিত ছিল।

কম্বোজ—এরা ইরানীয়। বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এদের কতকগুলি উপনিবেশ ছিল। তার মধ্যে কান্দাহারের উপনিবেশ উল্লেখযোগ্য।

কলিঙ্গ—উড়িষ্যার পুরী ও কটক জেলার এবং আন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম্ জেলার সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ। অশোক কলিঙ্গদেশ অধিকার করেছিলেন। তোসলী ও সমাপাতে এর শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল।

কারুবাকী—'চারুবাকী' দ্রষ্টব্য।

কেরলপুত্র—দক্ষিণভারতে অবস্থিত কেরলদেশের রাজার উপাধি-বিশেষ।

কৌশাম্বী—প্রাচীন বৎসদেশের রাজধানী। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কোসামই প্রাচীন কালের কৌশাম্বীনগরী।

ক্রোশ—প্রায় সওয়া দুই মাইল বা সাড়ে তিন কিলোমিটারের দূরত্ব।

॥ খ ॥

খেপিঙ্গল—জৌগড়াপর্বতের মৌর্যযুগীয় নাম।

॥ গ ॥

গঙ্গাপুৎপুটক—সম্ভবতঃ গঙ্গানদীর কোন মৎস্যের নাম। অশোক একে অবধ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

গন্ধার—একসময় বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম ছিল। তখন পেশোয়ারের নিকটবর্তী পুষ্কলাবতী এবং রাওয়ালপিণ্ডির নিকট-বর্তী তক্ষশিলা এর দুটি রাজধানী ছিল। কিন্তু অশোকের সময় তক্ষশিলা-অঞ্চল সম্ভবতঃ গন্ধারের অন্তর্গত ছিল না।

গেলাট—'গৈরাট' দ্রষ্টব্য।

গৈরাট—সম্ভবতঃ পর্বতবাসী কোন পক্ষী। প্রাকৃতে আছে 'গেলাট'।

॥ চ ॥

চপল—অশোকের জনৈক লিপিকর। প্রাকৃতে আছে 'চপড'। সে দক্ষিণভারতের কর্ণাটকে কয়েকটি শাসন উৎকীর্ণ করেছিল। কিন্তু সে খরোষ্ঠীলিপিতে নিজের নাম লিখেছে। তাতে বোঝা যায় যে, চপল মৌর্যসাম্রাজ্যের পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের অর্থাৎ উদীচ্য বা উত্তরা-পথের অধিবাসী ছিল।

চাতুর্মাসী—সেকালে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন, চৈত্র থেকে আষাঢ় এবং শ্রাবণ থেকে কার্তিক এই চার-চার পূর্ণিমান্ত চান্দ্র মাসে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিনটি ঋতু গণনা করা হত এবং ঋতুশেষের পূর্ণিমাকে চাতুর্মাসী বলা হত। চাতুর্মাসীগুলি বিশেষভাবে পবিত্র তিথি বলে গণ্য ছিল।

চারুবাকী—অশোকের দ্বিতীয়া মহিষীর নাম। তাঁর গর্ভে কুমার তীবরের জন্ম হয়। প্রাকৃতে নামটি আছে 'কারুবাকী'।

চোড—চোল জাতি। তারা তামিলনাডুর তাঞ্জাবুর-তিরুচিরাপল্লি অঞ্চলে বাস করত। তাদের জনপদ অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ছিল।

॥ জ ॥

জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীর অথবা তার যেঅংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত, তার নাম। প্রাচীন ভারতীয় রাজগণকে অনেকসময় পৃথিবীর অধীশ্বর বলা হত। অশোকের অনুশাসনে তাঁর সাম্রাজ্যকে কখনও কখনও জম্বুদ্বীপ ও পৃথিবী বলা হয়েছে।

জৈন—জৈনেরা অশোকানুশাসনে 'নিগ্রন্থ' নামে অভিহিত হয়েছে।

॥ ত ॥

তক্ষশিলা—পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্তী প্রাচীন নগরী। গ্রীক বা যবনেরা বলত Taxila। তক্ষশিলা বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অনেকাংশ নিয়ে গঠিত মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তরাপথ প্রদেশের রাজধানী ছিল বলে বোধ হয়।

তাম্রপর্ণী—শ্রীলংকা বা সিংহলের অন্যতম প্রাচীন নাম।

তিষ্যা, তিষ্য—পুষ্যানক্ষত্রের এবং যেমাসে পুষ্যানক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় সেই পৌষ মাসের নাম। অশোক এই নক্ষত্রযুক্ত দিনটিকে পর্বদিন বলে গণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এটি তাঁর জন্মনক্ষত্র ছিল।

তীবর—অশোকের দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্র।

তুরমায়, তুলমায়—মিশরদেশের যবনবংশীয় রাজা Ptolemy II Philadelphus (২৮৫-২৪৭ খ্রী-পূ)। তাঁর সঙ্গে অশোকের বন্ধুভাব ছিল।

তোসলী, তোষলী—কলিঙ্গদেশের প্রধান নগরী। নামটির বর্তমান রূপ 'ধৌলি' (প্রাকৃত 'তোহলী'='ধোঅলী' থেকে)। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী প্রাচীন নগরী।

॥ দ ॥

দেবপ্রিয়—অশোকের নাম বা উপাধিবিশেষ। অনুশাসনে আছে 'দেবানাম্প্রিয়' অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয়। এর সঙ্গে অনেক সময় 'প্রিয়দর্শী' নামটি যুক্ত হয়।

॥ ধ ॥

ধর্ম—তৃতীয় ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসনে অশোক ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে সদ্ধর্ম বা সত্যধর্ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনুশাসনসমূহের অন্যত্র বহুস্থানে ধর্ম বলতে অহিংসা, দয়া, দান প্রভৃতি গুণের সমষ্টি বোঝানো হয়েছে যা অনুসরণ করে লোকে পারলৌকিক সুখ ও স্বর্গ লাভ করতে পারে। এবিষয়ে অশোক বুদ্ধের অনুবর্তী ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

ধর্মমহামাত্র—ধর্মসম্পর্কিত সমস্ত বিষয় যাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংজ্ঞা। অশোক বলেছেন যে, তিনিই প্রথম ধর্মমহামাত্রের পদ সৃষ্টি করেন। ভারতীয় রাজাদের ধর্মকার্যে—বিশেষতঃ দানব্যাপারে সাহায্যের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হত। অশোক সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীদের এই কাজে প্রথম নিয়োগ করেছিলেন।

॥ ন ॥

নন্দিমুখ, নন্দীমুখ—একপ্রকার জলচর পক্ষী। অশোক এগুলিকে অবধ্য ঘোষণা করেছিলেন।

নাভক—এক অজ্ঞাত জাতিবিশেষ।

নাভপঙ্‌ক্তি—এও একটি অজ্ঞাত জাতি।

নিগ্রন্থ—'জৈন' শব্দ দ্রষ্টব্য। জৈনদের উপাস্য তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরকে জিন ও নিগ্রন্থ বলা হত।

ন্যগ্রোধ—বিহারের অন্তর্গত গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়ের একটি ক্ষোদিত গুহার নাম। 'ন্যগ্রোধ' শব্দের অর্থ বটবৃক্ষ। এই অর্থেও অশোকানুশাসনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ প ॥

পাটলিপুত্র—'অশোক' দ্রষ্টব্য।

পাণ্ড্য—তামিলনাড়ুর মাদুরৈ-রামনাথপুরম-তিরুনেলবেলি অঞ্চলবাসী জাতিবিশেষ। তাদের জনপদ অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে

অবস্থিত ছিল। তাদের রাজধানীর নাম ছিল মথুরা (বর্তমান স্থানীয় উচ্চারণে 'মাদুরৈ') অথবা দক্ষিণমথুরা।

পুনর্বসু—নক্ষত্রের নাম। পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনকে অশোক পর্বদিন বলে গণ্য করেছেন। সম্ভবতঃ এটি মগধদেশের নক্ষত্র ছিল।

পুরুষ—'মহামাত্র' দ্রষ্টব্য। 'পুরুষ' অর্থ রাজপুরুষ।

পুলিন্দ, পৌলিন্দ—বিন্ধ্যপর্বতবাসী জাতিবিশেষ।

পৈত্র্যণিক—'ভোজ' ও 'রাষ্ট্রিক' দ্রষ্টব্য। এই দুটি জাতিবাচক নামের অন্য অর্থ আছে। তা থেকে পৃথক্ করার জন্য তাদের 'পৈত্র্যণিক' বা বংশানুক্রমিক বলা হয়েছে।

প্রতিবেদক—চরশ্রেণীর কর্মচারী।

প্রাদেশিক—এক শ্রেনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংজ্ঞা। সম্ভবতঃ প্রাদেশিকেরা কতকগুলি জেলা নিয়ে গঠিত প্রদেশের শাসক ছিল।

প্রিয়দর্শী—অশোক সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত ছিলেন। অনেক সময় এর সঙ্গে দেবপ্রিয় নামটি সংযুক্ত হত। বোধহয় সেকালের আরও কোনও কোনও রাজা এইরূপ নামে উল্লিখিত হতেন।

বিনয়সমুৎকর্ষঃ—পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থবিশেষের নামের সংস্কৃত রূপ। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীপ্রমুখ সকল শ্রেনীর বৌদ্ধগণের শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য অশোক কর্তৃক নির্ধারিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম।

বুদ্ধ—বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীলংকা বা সিংহলের কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৪ অব্দে তাঁর জন্ম এবং ৫৪৪ অব্দে আশী বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু একখানি প্রাচীন দলিল অনুসারে তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৪৮৬ খ্রী-পূ। তাঁর প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ; কিন্তু তাঁকে গৌতম, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ 'যিনি চরমজ্ঞ'নের

অধিকারী হয়েছেন'। এইরূপ তাঁকে 'তথাগত' প্রভৃতিও বলা হয়। সিদ্ধার্থ নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে জন্মলাভ করেন। তিনি সম্বোধি বা মহাবোধি অর্থাৎ বর্তমান বোধগয়াতে বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। উত্তরপ্রদেশে বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে তিনি সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন এবং ঐ প্রদেশের দেওড়িয়া জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে (বর্তমান কাসিয়াতে) মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন (অর্থাৎ দেহরক্ষা করেন)। এই চারটি স্থান বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

বুদ্ধশাক্য—বৌদ্ধ উপাসক বোঝাতে শব্দটি একবার ব্যবহৃত দেখা যায়।

বেদবেয়ক—পক্ষী বা পশুবিশেষ। অশোক কর্তৃক এর বধ নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ব্রজভুমিক—অশোকের গোশালা, গোচরভুমি প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ব্রাহ্মণ—হিন্দুগণের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্প্রদায়। অনুশাসনে একবার 'ইভ্য', 'অর্য' ও 'ভৃত্য' শব্দে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বোঝানো হয়েছে।

॥ ভ ॥

ভোজ—অশোকের সাম্রাজ্যবাসী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ভোজ এবং রাষ্ট্রিকজাতি মহারাষ্ট্রের বেরার অঞ্চলে বাস করত। 'ভোজ' শব্দের একটি অর্থ জায়গীরদার। তাই অশোকানুশাসনে জাতিবাচক 'ভোজ' শব্দের সঙ্গে 'পৈত্র্যণিক' অর্থাৎ বংশানুক্রমিক শব্দ সংযুক্ত হয়েছে।

॥ ম ॥

মকা বা মগা—উত্তর-আফ্রিকার Cyrene জনপদের যবনজাতীয় রাজা Magas (আ ২৮২-২৫৮ খ্রী-পূ)। তাঁর সঙ্গে অশোকের বন্ধুভাব ছিল।

মগধ—বর্তমান বিহারের পাটনা ও গয়া অঞ্চলকে মগধ বলা হত। গয়া অঞ্চলের বিশেষনাম ছিল কীকট। মগধ ছিল মৌর্যসাম্রাজ্যের

কেন্দ্রীয় জনপদ। গিরিব্রজ, রাজগৃহ এবং পাটলিপুত্র ক্রমান্বয়ে মগধের রাজধানী হয়েছিল।

মহামাত্র—অশোকের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীর সংজ্ঞা। শাসনের নানা সংস্থায় মহামাত্রগণ নিযুক্ত হত। কাজের প্রকৃতি অনুসারে কখনও কখনও মহামাত্রদের সংজ্ঞা বিভিন্ন প্রকার হত—যেমন ধর্মমহামাত্র, অন্তমহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্র, ইত্যাদি।

মাণেমদেশ—প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশাসনের পানগুড়াড়িয়া সংস্করণে উল্লিখিত। ঐ দেশের একটি বৌদ্ধবিহারে অশোক তীর্থপর্যটন উপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। দেশটির অবস্থান অজ্ঞাত।

মুনিগাথা—পালিভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নামের সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ। অশোক যে সাতখানি গ্রন্থের শ্রবণ ও অনুধাবন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী প্রভৃতির অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত করেছিলেন, তার মধ্যে একখানি।

মৌনেয়সূত্রম্—অশোক কর্তৃক সর্বশ্রেণীর বৌদ্ধগণের শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য নির্ধারিত অপর একখানি শাস্ত্রগ্রন্থের পালি নামের সংস্কৃত রূপ।

॥ য ॥

যবন—পশ্চিম-এশিয়ার Asia Minor-এর অন্তর্গত Ionia-তে উপনিবিষ্ট গ্রীকেরা এবং সেই সূত্রে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা ইরানীয়দের কাছে 'যৌন' নামে পরিচিত ছিল। গ্রীকদের এই নাম ভারতীয়েরা গ্রহণ করেছিল। 'যৌন' উচ্চারণভেদে সংস্কৃতে 'যবন' আকার গ্রহণ করে। এর প্রাকৃত রূপ 'যোন'। অশোকের গ্রীক প্রজাগণ যবন এবং ইরানীয় প্রজারা কম্বোজ নামে পরিচিত ছিল। অশোকানুশাসনে পশ্চিম-এশিয়ার গ্রীকজাতীয় রাজা Antiochus-কে যবনরাজ বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে সমস্ত বিদেশী জাতিই ভারতবর্ষে যবন নামে পরিচিত হয়।

যুক্ত—অনুশাসনে উল্লিখিত 'যুক্ত' শব্দটি সাধারণভাবে 'কর্মচারী' অর্থে

কিংবা নির্দিষ্ট কোন কর্মচারীর সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা বিতর্কিত বিষয়। আমরা ঐ শব্দটিতে 'কর্মচারী' বুঝেছি।

যোজন—চারক্রোশ অর্থাৎ প্রায় নয় মাইল বা সাড়ে চৌদ্দ কিলো-মিটারের দূরত্ব।

॥ র ॥

রজ্জুক—অশোকের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সংজ্ঞা। রজ্জুক সম্ভবতঃ জেলার শাসক ছিল।

রাষ্ট্রিক—অশোকের অপর একশ্রেণীর কর্মচারীর সংজ্ঞা। রাষ্ট্রিক বোধহয় জেলার অংশ অর্থাৎ মহকুমা বা পরগনার শাসক ছিল। সে ছিল রজ্জুকের আজ্ঞাধীন। আবার জাতিবিশেষের নামও ছিল রাষ্ট্রিক। তাই অশোকানুশাসনে জাতি-অর্থে ব্যবহৃত হলে শব্দটির সঙ্গে 'পৈত্র্যণিক' (অর্থাৎ বংশানুক্রমিক) বিশেষণ যুক্ত দেখা যায়।

রাহুলাববাদঃ—পালিভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের সংস্কৃত রূপ। অশোক যে গ্রন্থগুলি সর্বশ্রেণীর বৌদ্ধের শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, এটি তার মধ্যে একখানি।

॥ ল ॥

লিপিকর—লেখকশ্রেণীর কর্মচারী। এরা বিভিন্ন স্থানে অশোকের লেখমালা প্রস্তরের উপর লিখে উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা করত বলে বোধ হয়।

লুম্বিনীগ্রাম—ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান বলে বৌদ্ধগণের মহাতীর্থ। নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত পড়রিয়া গ্রামের নিকটে অবস্থিত রুম্মিনদেঈ (লুম্বিনীদেবী) মন্দিরের কাছে অশোকের স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। এর অদূরেই শাক্যদের রাজধানী 'কপিলবাস্তু' অবস্থিত ছিল। পালি 'কপিলবত্থু' থেকে ভ্রমক্রমে নামটিকে কখনও বা 'কপিলবস্তু' বলা হয়েছে। এই নগর উত্তরপ্রদেশের বস্তী জেলার পিপ্রাহ্বা গ্রামে অবস্থিত ছিল। উৎখননের ফলে এখানে কুষাণ সম্রাট্প্রতিষ্ঠিত দেবপুত্রবিহারের অধিবাসী কপিলবাস্তুর ভিক্ষুসংঘের কতকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে।

॥ শ ॥

শাক্য—লিচ্ছবি ও মৌর্যদের ন্যায় শাক্যেরা হিমালয় অঞ্চলের আর্যেতর জাতি। তাদের সকলেরই দেহে মোঙ্গোলীয় রক্ত প্রবাহিত ছিল। ভগবান্ বুদ্ধ এই শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আর্যসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাক্যেরা আপনাদিগকে ইক্ষাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়জাতি বলে দাবি করত, যদিও গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাদিগকে বৃষল বা শূদ্র বলতেন। অনুশাসনে 'শাক্য' শব্দটি বৌদ্ধ-উপাসক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থে 'শাক্যপুত্র' শব্দটিও প্রচলিত ছিল।

শ্রমণ—বৌদ্ধ ভিক্ষু।

॥ স ॥

সংঘ—বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংস্থা বা তাদের সামগ্রিক নাম। বৌদ্ধধর্মের তিন অঙ্গের নাম—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ।

সমাপা—উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় জৌগড়ার নিকট অবস্থিত প্রাচীন নগরী। এখানে কলিঙ্গদেশের একটি শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল।

সংব—তিনি মৌর্যরাজবংশজাত 'কুমার' ছিলেন এবং পানগুড়াড়িয়াঁ অঞ্চল শাসন করতেন। সম্ভবতঃ তিনি অশোকের পুত্র ছিলেন না। সপ্তম মুখ্য স্তম্ভলিপিতে আপন পুত্র বোঝাতে অশোক 'দারক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর জনৈক পুত্র নিজকে 'আর্যপুত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্বোধি—মহাবোধি অর্থাৎ বোধগয়ার নাম। 'বুদ্ধ' দ্রষ্টব্য।

সাতিয়পুত্র—কেরলের উত্তরদিক্‌স্থিত জনপদের রাজার উপাধিবিশেষ। 'সাতিয়' জাতির সংস্কৃত নাম 'শাস্তিক' ছিল বলে বোধ হয়।

স্খলতিক পর্বত—বিহারের অন্তর্গত গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়ের প্রাচীন নাম।

সুবর্ণগিরি—'আর্যপুত্র' দ্রষ্টব্য।

স্তূপ—বুদ্ধ এবং কোনও কোনও বৌদ্ধ সাধুর দেহাবশেষের উপর নির্মিত সমাধিবিশেষ।

স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্র—অশোকের অন্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী।